খেয়ালী কবি-সৈনিক

(ছোটদের প্রিয় কবি নজরুল)

দক্ষিণারঞ্জন বসু

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ১০ ডিসেম্বর ১৯৫৭

প্রকাশক :

পপুলার লাইব্রেরীর পক্ষে

সুনীলকুমার ঘোষ এম. এ

১৯৫/১ বি, বিধান সরণি

কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :

সতীশচন্দ্র সিকদার

বন্দনা ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড

৭/১ মনোমোহন বসু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী

অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

কবি নজরুল ইসলামের
তুই পৌত্র শ্রীমান অনির্বাণ ও
শ্রীমান অরিন্দমকে

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

শিশুর মতো সরল এবং শিশুর মতোই খেয়ালী এমন আর কোন কবি আছেন আমাদের দেশে যিনি জন্ম থেকেই সৈনিক। জীবনের শুরু থেকেই লড়াই করে চলেছেন দুখু মিঞা দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে, আরেকটু বড়ো হয়ে তাঁকে ধর্মীয় বৈষম্য ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করতে হয়েছে এবং তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের ডাকে তিনি প্রকৃতপক্ষেই রণাঙ্গনে যেয়ে হলেন হাবিলদার—শাসক ইংরেজের কাছ থেকে সংগ্রামের কৌশল ও অস্ত্রবিদ্যা শিখে নিয়ে বিদেশী শাসককে এদেশ-ছাড়া করবেন এটাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। করাচী সেনা-নিবাসের বাঙালী পল্টনের সেই হাবিলদার কবি তিন বছর পর যুদ্ধ শেষে কলকাতায় ফিরে এলেন বিদ্রোহী বেশে। তাঁর সে সময়কার রচিত দীর্ঘ 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে বিরাট আলোড়ন পড়ে গেল। লোকের মুখে মুখে তখন শোনা যেত একটি নাম—বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম! এই কবিই পরবর্তীকালে 'জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত'দের জাগ্রত হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহ, শুধু ইংরেজরাজেরই বিরুদ্ধে নয়, তাঁর প্রথম বিদ্রোহ ভগবানের বিরুদ্ধে যার সৃষ্ট সংসারে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও বৈষম্যের শেষ নেই। তাই তো কবি বলেছেন:

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

নিজেকে কবি 'জগদীশ্বর-ঈশ্বর' ধরে নিয়ে লিখেছেন:

আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!'
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে।

আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
আমি সেই দিন হব শান্ত!

এই বিদ্রোহ ঘোষণার পর থেকে কবিকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে গোলামির ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, অসাম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কার ও জাতির বজ্জাতির বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে। শিশু-কিশোর-যুব সমাজ মেতে উঠেছে তাঁর বিদ্রোহাত্মক সব গানে ও কবিতায়, নাটকে ও অন্যান্য রচনায়। কিন্তু এত সত্ত্বেও আজীবন বিদ্রোহী খেয়ালী কবি-সৈনিকের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়নি। উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোলের মধ্যে একান্ত রণক্লান্ত অবস্থাতেই তাঁকে চির বিদায় নিতে হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের পর থেকে আগষ্ট আন্দোলনের শুরু অবধি কাজী নজরুলের প্রকৃত কবি-জীবন। মাত্র এই বাইশ-তেইশ বছরের মধ্যে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবি যে বিপুল পরিমাণ কবিতা, গান ও ছড়া (বিশেষ করে গান) ইত্যাদি দেশের মানুষকে দিয়ে গেছেন, প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে তার কোনো তুলনা মেলে না। একবার কবির বাল্যবন্ধু কথাশিল্পী শৈলজানন্দ তাঁকে বলেছিলেন -এত লিখো না। এত বেশী লিখলে অনেক বাজে লেখা বেরিয়ে আসবে।

আসবেই তো। আমি তা জানি। তুমিও তো শিল্পী, তোমারও তো খুব নাম। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতো - তোমার সব গল্প ভাল হয়?

নজরুলের এ প্রশ্নের উত্তরে বন্ধুকে বলতে হয়েছিল, না, তা হয়না।

— তবে আমাকে বলছো কেন?

—সে কথা সত্যি। বলা আমার অন্যায় হয়েছে।

তারপর শৈলজানন্দ বললেন, ফুলগাছ কখনো হিসেব করে গুণে গুণে ফুল দেয় না। ফুল যখন ফোটে তখন অজস্র বেহিসেবী ফুলও ফোটে। তার অধিকাংশ ঝরে পড়ে মাটিতে। খুব কমই যায় পূজার মন্দিরে।

বন্ধুর এ কথাটি খুবই ভালো লেগেছিল নজরুলের। তিনি এর

উত্তরে বলেছিলেন, বেশ উপমা দিয়েছ। ঠিক বলেছ আমরা ফুলের গাছ। ফুল ফোটাতে এসেছি, ফুল ফুটিয়ে যাব, হিসেব করাতো গাছের কাজ নয়। হিসেব করবে অন্য লোক।

এ কথার ওপর মন্তব্য করেছেন শৈলজানন্দ, নিজের সৃষ্টির প্রতি এমন নিরাসক্ত শিল্পী নজরুলের মতো আমি আর কাউকে দেখিনি।

খুবই সত্যি কথা। তাছাড়া মাইকেল মধুসূদনের পর এমন নাটকীয় আজীবন সংগ্রামী খেয়ালী কবি-সৈনিকও বাংলা সাহিত্যে আর আবির্ভূত হননি। তাই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে নজরুল জীবন-কথার ওপর একখানি গ্রন্থ রচনার জন্যে পপুলার লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী প্রীতিভাজন শ্রী সুনীল ঘোষ আমায় অনুরোধ জানালে আমি 'খেয়ালী কবি-সৈনিক' নামেই দেশপ্রেমিক মানবপ্রেমিক ও ঈশ্বর বিশ্বাসী এই কবি-গায়ককে ছোটদের কাছে তুলে ধরে একখানি বই লিখতে শুরু করি। দুঃখের বিষয় লেখা শেষ হবার আগেই আমি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি যার ফলে বইখানি প্রকাশে বেশ বিলম্ব হয়ে গেল। যাইহোক শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার মধ্যেই যে আমি লেখা শেষ করে দিতে পেরেছি এবং শিশুবর্ষের মধ্যেই যে বইখানির প্রকাশ সম্ভব হলো তা সুখের বিষয়।

এ গ্রন্থ রচনায় নজরুলের বিভিন্ন পুস্তক ছাড়া তাঁর ওপর রচিত বহু বই আমাকে পড়তে হয়েছে। স্বভাবতই সেসব বই থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি। সে সব গ্রন্থকারদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ 'খেয়ালী কবি-সৈনিক' বইখানি দেখে যেতে পারলে খুবই খুশী হতেন। কিন্তু বিধির বিধানে তা সম্ভব হলো না। যাই হোক কবি-পৌত্র এবং কাজী অনিরুদ্ধ ও শ্রীমতী কল্যাণীর দুই পুত্র শ্রীমান অনির্বাণ ও শ্রীমান অরিন্দমের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত! ওরা আজও আমার প্রতিবেশী।

৬৪। ১৩ বেলগাছিয়া রোড

কলকাতা-৩৭

সূচীপত্র

বালক কবি

বোন তার সাত ভাইকে গভীর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করছে জীবনে তারা কে কি হতে চায়। তার প্রশ্ন :

সাত ভাই চম্পা কে কি হবি বল্।
তোরা কে কি হবি বল্।
কেলো, ভুলো, হেব, পচা, ভুতো, ন্যাড়া, ডল ॥

প্রথম ভাই উত্তরে বললে ঃ

আমি হব কাবলীওয়ালা,
এক কুলো চাপ দাড়ি,
'তেড়ে মুসে আগা, মোর মাগায়া,
লেয়াও রূপী তাড়াতাড়ি।'

বড় ভাইয়ের কথা শেষ হতেই দ্বিতীয় ভাই তার মনের সাধ জানালো :

আমি হব পণ্ডিত মশাই,
কাঁপবে ছেলের দল
দেখে, কাঁপবে ছেলের দল ॥

দ্বিতীয় জন থামতেই তৃতীয় ভাই জবাব দিলে এই বলে :

আমি হব ফেরিওয়ালা,
চাই চানাচুর, ঘুগ্‌নি দানা।
পাড়ায় পাড়ায় ফিরব ঘুরে,
পারবে না কেউ করতে মানা।
রাতে হাঁকব 'কুলফী বরফ'
হায় কি মজার কল্ ॥

তৃতীয় ভাইয়ের উত্তরটা একটু লম্বা হলেও চতুর্থ ও পঞ্চম ভাইয়ের জবাব হলো দু'লাইন করে। চতুর্থ ভাই চটপট যেই বললে :

আমি হব জজ সাহেব,
দেব ফাঁসি ছ'মাস করে!

অমনি পঞ্চম ভ্রাতা বলে উঠলো :

দারোগা আমি,
তোর জজকে চালান দেব থানায় ধরে।

ষষ্ঠ ভাই পিছিয়ে থাকার পাত্র নয়। সে লাফিয়ে উঠে বললে :

আমায় দেখে দারোগা গুরুম্,
আমি হব কনিষ্ট-বল্ ॥

এরপর সপ্তম অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট ভাই একেবারে সেরা কথা বললে বাড়ির কর্তা অর্থাৎ ঠাকুরদা হবার সাধ প্রকাশ করে :

আমি হব বাবার বাবা,
মা সে আমার ভয়ে
ঘোমটা দিয়ে লুকোবে কোণে
চুনি-বিল্লি হ'য়ে!
বলব বাবায়, 'ওরে খোকা
শীগ্‌গির পাঠশাল চল্ ॥

কি মজা, তাই না? সেই আদ্যিকালের ছড়া 'সাত ভাই চম্পা'র ধাঁচে ফেলে একালের কবি ছড়ায় কী সুন্দর একটি বোন-ভাইদের গল্প রচনা করেছেন! ছোটদের খুশী করবার জন্যে এমনি আরো কত ছড়া-কবিতা-গান ও মজার মজার নাটক তিনি লিখে গেছেন বড়ো হয়ে। তাঁর বাল্য-রচনায়ও এসবের কি কম ছড়াছড়ি। তাঁর লেখা ছোটদের নাটকে এমন ছড়া ও গান রয়েছে যা শুনে বা পড়ে কখনো হাসি পায় এবং কখনো খুবই ভাবিয়ে তোলে। এ কবির ছেলেবেলার রচিত ছড়া, গান ও কবিতা থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, এর মধ্যেই তাঁর যে কাব্য-প্রতিভার পরিচয় রয়েছে তাতে তাঁকে দেশের এক মস্ত কবি হতেই হবে। কবি গরীব চাষীর ছেলে। বানরের উৎপাতে ফসল বাঁচানো খুবই কঠিন। সমবয়সীদের নিয়ে বানর-মারা দল গড়ে 'চাষার সং' পালায় ছড়া তৈরি করে গেয়েছিলেন কবি :

আমরা যে ভাই বানর-মারা
বানরের যম সবাই জানে।

বানর শিকার করে ফিরি
আমরা যখন যাই যেখানে।

পশু-পাখির দিকে বালক-মন খুব সহজেই ধেয়ে যায়। বশেষ করে কবি-প্রাণ স্বভাবতই বড়ো কোমল। তাই একটি 'চড়ুই পাখীর ছানা' নিয়ে ঐ কিশোর কবিকে একদিন লিখে ফেলতে হলো এক অপূর্ব কবিতা। তিনি লিখলেন :

মস্ত বড় দালান-বাড়ীর উই-লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট্ট একটি চড়াই ছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।
'চুঁচা' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে,
মায়ের পরাণ ভাবলে—বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছা-য়ে।

অমনি কাছের মাঠটি হ'তে ছুটল মাতা ফড়িং মুখে,
স্নেহের আকুল আশীষ-জোয়ার উথলে ওঠে মা'র সে বুকে।
আধ-ফুরফুরে ছা'টি নিড়ে দেখেছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমিই যাই না ছুটে, বসি গে মা'র বক্ষ জুড়ে।

হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে উড়তে গেল অবোধ পাখী
ঝুপ ক'রে সে গেল পড়ে—ঝরল মায়ের করুণ আঁখি!
হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠল কেঁপে,
রাখলো নাকো প্রাণের মায়া, বসল ডানায় ছা'টি ঝেঁপে!

ধরতে ছোটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে ;
ছুটছে পাখী প্রাণের ভয়ে ছোট্ট দু'টি ডানা মেলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন,
বুঝে না কেউ ক্লাসের ছেলে—মায়ের সে যে বুকভরা ধন।

পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে দেখছে, আঁসু চোখ দু'টি তার যাচ্ছে ভেসে।

মা মরেছে বহু দিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠলো বেজে করুণ বেহাগ।

মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে,
ছানার দু'টি সজল আঁখি করলে আশীষ পরাণ খুলে।
অবাক নয়ন মা'টি তাহার রইল চেয়ে পাঁচুর পানে,
হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।

পাখীর মায়ের নীরব আশীষ যে ধারাটি' দিল ঢেলে,
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!

যে কিশোর কবির কলম থেকে এমন একটি দরদভরা অসামান্য কবিতার সৃষ্টি হতে পারে তাঁর হৃদয় সমুদ্রে যে অনুক্ষণ মমতার তরঙ্গ নেচে চলে তা সহজেই ধরতে পারা যায়।

কিন্তু কে এই কিশোর কবি? তিনি কি আরো এমনি অনেক ছড়া, কবিতা, গান, হাসির গল্প ও শিশু-নাটিকা ইত্যাদি লিখেছেন? তাঁর লেখা শিশু-নাটিকায় ভারি মজার ছড়া, গান ও কবিতা রয়েছে। এখানে 'পুতুলের বিয়ে' এবং 'জাগো সুন্দর চির কিশোর' নাটিকা দু'টি থেকে সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েই দেখানো যেতে পারে কবির মধ্যে যে একটি শিশুমন লুকিয়ে ছিল সেই শিশুটির মাধ্যমে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সব ইচ্ছেকে তিনি কী সুন্দরভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন। তাঁর 'পুতুলের বিয়ে' নাটিকায় জাপানী পুতুল আর চীনে পুতুলের বিয়ের ব্যাপারটায় সব মা-ই যেভাবে মেয়েকে বিয়ে দিতে চান সে ইচ্ছেটা একটি ছড়ায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। পুতুল খেলার সাথীদের মধ্যে একজন ছড়ায় বলছে :

খুকুর দেব বিয়ে বেগম-মহলে,
খুকু হবে বেগম সাহেবা, বাঁদী সকলে।
খুকু হাতে পরবে হীরের বালা
গলায় পড়বে মুক্তোর মালা।

সোনার খাটে থাকবে শুয়ে রূপোর মহলে
শতেক বাঁদী বাঁধবে চুল নাইবে গোলাপ জলে।

এই ছড়াটি শেষ হতে হতেই সেখানে আর এক সাথী একটি মজার ছড়া-গান গাইতে গাইতে এসে হাজির। ছোটদের কাছে আচার খুবই প্রিয় জিনিষ। সেই আচার এবং আর যে সব জিনিষ ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভালোবাসে সে সব নিয়েই এই ছড়া গানটি তৈরি। ছড়াটিতে বলা হয়েছে :

কুলের আচার নাচার হ'য়ে
আছিস কেন শিকায় ঝুলে।
কাচের জারে বেচারা তুই
মরিস কেন ফেঁপে ফুলে॥
কাঁচা তেঁতুল পেয়ারা আম
ডাঁশা জামরুল আর গোলাপজাম—
যেমনি তোরে দেখিলাম
অমনি সব গেলাম ভুলে॥

এই পুতুল খেলাব সাথীটিব মুখেরই আর একটি ছোট্ট সুন্দর ছড়া :

মা গো মা,
আমি বিবি হব না!
আম কুড়োব জাম কুড়োব, কুড়োব শুকনো পাতা,
সোয়ামী করবে লাঙল চাষ আমি ধরব ছাতা।

গাঁয়ের মুসলমান চাষী ঘরের আট বছরের মেয়ে যাকে তার আব্বা বকেন বাইরে বেরুলে এবং তার আম্মাকে বলেন তাকে পর্দার ভেতর বিবি করে রাখতে তার মুখ থেকে এমনি ছড়াইতো স্বাভাবিক।

কিন্তু 'পুতুলের বিয়ে' নাটিকাটিতে দু'জোড়া বিয়ের ব্যবস্থা করে এমন হাসি-তামাসার পরিবেশ তৈরি করেছেন কবি যে তা আর বলার নয়।

বাচ্চা বয়েস কালটাইতো মেয়েদেব পুতুল খেলায় মজে থাকার সময়। তাইতো পুতুল খেলতে খেলাতে মেয়ের দল গান ধরেছে :

খেলি আয় পুতুল খেলা
বয়ে যায় খেলার বেলা সই।

সত্যিই তো বড়ো হয়ে গেলে তো আর এভাবে পুতুল খেলা যাবেনা। তাই ওদের পুতুল ছেলে ও পুতুল মেয়ের মধ্যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। কমলির এক পুতুল ছেলের নাম ডালিমকুমার এবং তার আর এক চীনা পুতুল ছেলের নাম ফুচুং। ডালিমকুমারের সঙ্গে টুলির পুতুল মেয়ে পুঁটুরাণীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হলো। কমলির খ্যাঁদা ফুচুং ছেলেটার জন্যে ক'নে পেতে প্রথমটায় একটু অসুবিধা হলেও শেষ পর্যন্ত বেগমের জাপানী গেঁইসা পুতুলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংহের মেয়ে পঞ্চি চীনা বর ফুচুংকে নিয়ে এমন এক ছড়া গান গাইতে শুরু করলো যা শুনে সবাই একেবারে হেসে আকুল। পঞ্চি গাইতে লাগলো :

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খ্যাচ খ্যাচায়।
প্যাঁচায় গিয়া উঠল গাছ,
কাওয়ারা সব লইল পাছ।
প্যাঁচার ভাইশতা কোলা ব্যাং
কইলো, চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচায় কয় বাপ বারিত যাও
পাছ লইছে সব হাপের ছাও।
ইন্দুর জবাই কইরা খায়।
বোঁচা নাকে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচায়॥

এই ছড়াগানটিতে প্রবল হাসির রোল সৃষ্টি হলেও বাঁকুড়ার মেয়ে খেঁদি কঠিন একটা প্রশ্ন তুলে বসলো কমলির কাছে। সে জিজ্ঞেস করলো কমলিকে, 'আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি ক'রে খ।'

এখানে কমলির উত্তরটি মনে রাখার মতো। সে বললে, 'না ভাই, ও কথা বলিস নে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান।

অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা', আমাদের ভগবানও তা'। বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছিলেন...।' টুলিকে সঙ্গে নিয়ে সে গানটা গাইলো কমলি :

মোরা এক বৃন্তে দু'টি ফুল হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান ॥
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক সে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই।
এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

এই গানটির রচয়িতা কবি সবারই চেনা এবং সবারই প্রিয় কবি। ছোটবেলা থেকে যিনি এত হাসিয়েছেন ছোট বড়ো সবাইকে এবং ভাবিয়েছেনও সব শ্রেণীর মানুষকে, তাঁর কথা বিস্তারিতভাবে জানার ইচ্ছে কার না হবে ?

তবু সেই কবির জীবন-কথা জানার আগে তাঁর হাসির ছড়াগুলি এবং ভাবনার কথাগুলি আরো একটু বেশি করে জানা দরকার।

কমলি ও টুলি প্রভৃতির পুতুলদের বিয়ের উদ্যোগ যখন চলছিল তখন যে আশঙ্কা করছিল কমলি ঠিক তাই ঘটে বসলো। তার দাদা মণি বিয়ের আসরে এসে এমন এক হাসির গান গাইতে লাগলো যা শুনে সবাই হেসে কুটপাট। গানটি এই :

হেড মাষ্টারের ছড়ি, সেকেণ্ড মাষ্টারের দাড়ি
থার্ড মাষ্টারের টেড়ি, কারে দেখি কারে ছাড়ি।
হেড-পণ্ডিতের টিকির সাথে ওদের যেন আড়ি ॥
দাঁড়াইয়া ঐ হাইবেঞ্চে
হাসি রে মুখ ভেংচে,
খোঁড়া সেকেণ্ড পণ্ডিত যায় লেংচে

হুঁকো হাতে বাড়ি,
তার মুখ নয় তোলো হাঁড়ি,
মোব হেসে ছিঁড়ে যায় নাড়ী।

এ গান শেষ হতেই সুন্দব সুন্দর পুতুলগুলি দেখে মণিব খুবই আনন্দ হলো এবং কমলির পুতুল ছেলেদের ভাগ্নে বলে আদর করতে গেল। তা' নিয়ে কি কম রগড় হলো এর পর।

সে সব যাক। দু'জোড়া বিয়ের কথাই সংক্ষেপে বলি।

টুলি যে পুরুত ঠাকুরকে নিয়ে এলো তিনি ডালিমকুমার আর পুটুরাণীর বিয়ের পুরুতগিরি করতে রাজী হলেন বটে কিন্তু সনাতন ধর্মে যে নাম কখনো শোনা যায়নি সেই চীনে বর ফুচুং আর জাপানী কনে গেঁইসার, বিয়ের মন্ত্র পড়াতে তিনি অস্বীকার করলেন। এই বিদেশী বর-কনের বিয়ের দায়িত্বটা পুরুত ঠাকুবেব কথায় অগত্যা কমলির দাদা মণিকেই নিতে হলো।

দায়িত্ব নিয়েই সে অনুষ্ঠানের আয়োজনে উদ্যোগী হলো। বোনকে সে বললে, এই কমলি শীগ্‌গিব তুই তা' হলে এক ঝুড়ি আরসুলা আর গোটা দুই টিকটিকি, তিনটে সোনা ব্যাং, পোয়াখানেক কেঁচো, এক ডজন পঁচা ডিম আর খানিকটা নাপ্পি ক'রে আন, বুঝলি। ভোজ হবে।

ময়মনসিংহের মেয়ে পক্ষি এই শুনে ক্ষেপেই গেল একেবারে। রেগে গিয়ে সে তার জেলাব ভাষায়ই বললে, 'দ্যাহ দাদা, এইতুন এক চট্‌কণা নাগাইমু যে উৎকা মাইরা পইর‍্যা যাইব্যা! ওয়াক থুঃ! এ কি কয়, আমার বমি আইতেছে।

মণি তখন তাকে শান্ত করার জন্যে বললে, আরে, আরসুলার কাবাব, টিকটিকির চাটনি, পঁচা ডিমের ঘণ্ট, তারপর এই কোলাব্যাঙের কাটলেট, এ সব না হ'লে চীনেদের ভোজ হবে কি করে? আর, বেগম! তোরা ত ঈদের সময় সেমাই খাস, কেঁচো দিয়ে কি চমৎকার চীনে সেমাই হবে।

পুরুত ঠাকুর মশাই এসব শুনে গঙ্গাস্নানের কথা ভাবতে থাকলেন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিয়ের মন্ত্র পড়িয়ে পুরুত ঠাকুরতো ডালিম-কুমার ও পুটুরাণীর বিয়ের কাজ শেষ করে দিলেন কিন্তু ফুচুংকে মণি যে মন্ত্র পড়ালো তা শুনে পুরুত মশাই বললেন, এ আবার কোন্ মন্তর রে বাবা, যেমন উনুনমুখো দেবতা, তেমনি ছাইপাশ নৈবদ্যি।

তার দাদার মন্ত্র পড়ানো ঠিক হচ্ছে কিনা পুরুত ঠাকুরকে কমলি তা' জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আরে ঐ হয়েছে। হোক না কাঠের বেড়াল, ইঁদুর ধরলেই হলো।

এভাবে বিয়েপর্ব শেষ হলে শুরু হলো বর-কনে আশীর্বাদের পালা।

বেগম তার চীনা জামাইকে বললে, বাবা ফুচুং! উপরে আল্লা, নীচে তুমি। দেখ, আমার গেঁইসা (জাপানী পুতুল) যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

যেন গাই বাছুরে গোহাল ভরে
ধনে জনে ঘর ভরে,
আদর আহ্লাদ উপচে পড়ে।
যেন অষ্ট সুখে খায়
সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যায়।
ভিখ-ফকিরে আজলা আজলা ভিক্ষা পায়।
শ্বশুর শাশুড়ির চৌদোল এসে
পঞ্চ বাজন বাজিয়ে নিয়ে যায়।

টুলি তার নববিবাহিতা কন্যা পুটুরাণীকে এই বলে আশীর্বাদ করলো :

রাজরাজেশ্বর স্বামী হোক,
ভীমার্জুন ভাই হোক।
যেন উমার মত আদর পাস,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পাস
জয়াবিজয়া দাসী পাস,
কুবেরের ভাণ্ডার পাস।
ঘরে ঘটিবাটি ঝলমল করে,
আলনায় কাপড় দলমল করে।

বছর বছর পুত্র পাস।
হবে পুত্তুর মরবে না
চোখের জল পড়বে না।

আমাদের দেশের মায়েরাতো এমনি ভাগ্যই যুগ যুগ ধরে চেয়ে আসছেন তাঁদের মেয়েদের জন্যে। শুধু মায়েরাই নয়, এমন কি পড়শিরাও একই ধারায় আশীর্বাদ করতে অভ্যস্ত। এ অভ্যাস তারা শুরু করে একেবারে ছোট বয়সে পুতুল খেলার সময় থেকেই। বাঁকুড়ার মেয়ে খেঁদির আপশোস্, অন্যেরাই সব বলে ফেললে, সে আর এখন কি বলবে। তবু যে ভাষায় সে শুভ কামনা জানালো তাব বান্ধবীর মেয়েকে তা' সত্যি সত্যি মনে রাখার মত। খেঁদি বলছে ঃ

জন্ম জন্ম এয়ো হবি,
জামায়ের সুয়োরাণী হবি।
আকালের লক্ষ্মী হবি।
সময়ে পুত্রবতী হবি
সোনার কলসী টল্‌মল
ঘটে ঘটে গঙ্গা-জল।
একূল থেকে ওকূলে যাবি
দুই কুল শীতল করবি।
মায়েব কূলে ফুল বাপের কুলে ফল
শ্বশুর কুলে তারা,
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গা যমুনাব ধারা।
মা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকী
তিন কুল ভ'রে দাও ধনে জনে সুখী।

বিয়ের পর এমনি ভাবেই তো মা, মাসী, পিসী মাতৃস্থানীয়া গুরু-জনেরা এই সনাতনী প্রথায় কনেকে আশীর্বাদ করে থাকেন। পুতুলের বিয়ের মধ্য দিয়েই সে শিক্ষা লাভ হয়ে থাকে মেয়েদের, কবি-নাট্যকার সেটাই দেখিয়েছেন এ নাটিকায়। এসব আশীর্বাদী ছড়ায় অবশ্য জেলা অনুযায়ী ভাষার তারতম্য আছে। যেমন ধরা যাক পঞ্চির কথা।

সে ময়মনসিংহের মেয়ে। ময়মনসিংহের ভাষাতেই সে পুটুরাণীকে আশীর্বাদ করলো সে জেলার ভাষায় এই বলে ঃ

চুল মেলবা সোনার খাড়ে
নাইবা ধুইবা পদ্মার ঘাড়ে
ভাত খাইবা সোনার থালে
বেন্নন খাইবা রূপার বাড়িতে।
আচাইবা ডাবর-ভরা
পান খাইবা বিরা বিরা।
সুপারি খাইবা ছড়া ছড়া
খয়ের খাইবা চাক্কা চাক্কা।
চুন খাইবা খুটুরি-ভরা,
পেচ্‌কি ফেলাইবা লাদা লাদা।

বিয়ের পর মেয়ে সর্বরকমে সুখী হোক এই শুভ কামনাই সব গুরুজনদের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে থাকে আশীর্বাদের সময়। মুসলমানী বিয়েতেও আশীর্বাদের এবং বর-কনে বরণের গান ইত্যাদি প্রায় একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভাষার একটু রকমফের থাকে এই যা। বেগমকে দিয়ে যে বিয়ের গানটি কমলি গাওয়ালো তা থেকেই বিষয়টি পরিষ্কাব হবে। বেগম গাইলো ঃ

শাদী মোবারকবাদী শাদী মোবারক।
দেয় মোবারক বাদ আলম্ রসুলে-পাক আল্লা হক॥
আজ এ খুশীর মহফিলে
দুলহা দুলহিলে মিলে
মিল হ'ল প্রাণে প্রাণে
মাশুক আর আশক॥
আউলিয়া আম্বিয়া সবে
এস এ মিলন উৎসবে
দোওয়া কর আজ এ খুশীর
গুলিস্তান গুলজার হোক।

সব শেষে কমলির ঠাকুরমার ডাকাডাকি শুনে ওদের পুতুল বিয়ের উৎসবের সমাপ্তি ঘটানো হলো দীর্ঘ একখানা আশীর্বাদী গান গেয়ে যার শেষ স্তবকে বলা হয়েছে :

সভা উজ্জ্বল জামাই পাস,
ধরার মত সহ্য পাস
জন্মায়স্তে কাল কাটাস।
পাকা চুলে পরিস সিঁদুর হয়ে থাকিস স্বামীর সো।
বেঁচে থাকিস যত কাল অক্ষয় থাক হাতের নো।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে গঙ্গাজলে দেহ রাখিস্।
লহ লহ এই আশিস ॥

হিন্দু নববধূর প্রতি এইতো সবচেয়ে বড়ো আশীর্বাদ—স্বামী-পুত্র রেখে সংসার থেকে চির বিদায় নেওয়া। পুতুল পুতুল খেলার সময় থেকেই যে সে শিক্ষা মেয়েরা পেয়ে থাকে এ নাটিকায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এরপব 'জাগো সুন্দব চিব-কিশোব' নাটিকায় অপূর্ব কর্মোন্মাদনা ও সাগর জয় ও চাঁদেব দেশ মঙ্গল গ্রহ ইত্যাদি জয়েব স্বপ্ন-কাহিনী কত সুন্দবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। একটি কোবাস গান দিয়ে এই স্বপ্ন-নাটিকাব শুরু। চরিত্রের মধ্যে রয়েছে কঙ্কন, কামাল, ওঙ্কাব ও ভয়কাতুবে চাকাম ফুসফুস এবং তাদের কল্পনাদি, বেনু নামেব একটি মেয়ে ও এক ওড়িয়া ভৃত্য। প্রারম্ভিক কোবাস গানটি এই :

জাগো সুন্দর চির-কিশোর
জাগো চিব অমলিন দুর্জয় ভয়হীন
আসুক শুভদিন, হোক নিশিভোব ॥
অগ্নিশিখার সম সূর্যের প্রায়
জ্বলে ওঠ দিব্য জ্যোতির মহিমায়
দুব হোক সংশয়, ভীতি, নিরাশা
জড়প্রাণ পাষাণের ভাঙ ঘুমঘোর ॥

আমাদের কবি আজীবন নিশিভোরের ও শুভদিনেরই স্বপ্ন দেখেছেন এবং জড়প্রাণ পাষাণের ঘুমঘোর ভাঙানোর গানই গেয়েছেন চিরকাল। স্বপ্নতো আসলে কল্পনারই ব্যাপার এবং কিশোর-মন মূলত কল্পনা-প্রবণ। কিশোর বয়েসেই তাই ত্রিভুবন জয়ের স্বপ্ন মাতাল করে তোলে তরুণদের। কল্পনায় তারা কখনো চায় সাগর জয় করতে, কখনো চায় চাঁদের দেশে বা মঙ্গলগ্রহে যেতে। তাই ওদের কল্পনাদিই তাদের কার কি হবার ইচ্ছে এক এক করে জিজ্ঞাসায় তা জেনে নেয়।

কঙ্কন, প্রথমে চাঁদের দেশে এক নিমেষে উড়ে যেতে চাইছিল, তাবপর সাগর জয়ের ইচ্ছে পোষণ করছিল, তাই কল্পনাদি ওদের নিয়ে সাগর জলের তলে চলে গেল। কামাল ভয় পেয়ে কঙ্কনকে পালিয়ে আসতে বললে কল্পনাদি ওদের জানিয়ে দিলে যে এখন আর কোথাও যাওয়া চলবে না কাবণ তাদের ফুলের রথে চড়িয়ে সমুদ্রের জলে নামা শুরু হয়ে গেছে। ওঙ্কার চোখ বুজে আছে দেখে কল্পনা তাকে জিজ্ঞেস করে জানলো যে, একদল ভেড়ার কাছে সে এই চোখ বোজাব রীতিটি শিখে নিয়েছে। এক পাল ভেড়ার মধ্যে একটা নেকড়ে বাঘ ঢুকে পড়েছিল। তাই না দেখে ভেড়ার দল ভয়ে একসঙ্গে চোখ বুজে থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেলো বটে কিন্তু একটি একটি করে সব কটা ভেড়ার, ঘাড় নেকড়ে বাঘটা মটকে ফেললো।

এই কাহিনী শুনে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো চাকাম ফুসফুস (আসল নাম ন্যাড়া)। বড্ড ভীতু কিনা চাকাম, তাই। ভয়ে তার দাঁতে দাঁত লেগে আসছিল। কঙ্কনের কিন্তু বেশ লাগছিল সমুদ্রের ভেতর দিয়ে চলতে কিন্তু অত অন্ধকার কেন, সমুদ্রে কি আলো নেই? এ প্রশ্নের উত্তরে কল্পনাদি সবাইকে জানিয়ে দিলে, সাগর জলের নীচে মণি-মুক্তোর আলো রয়েছে।

সত্যি তাই। একটু বাদেই সাগর জলের পাতাল তলে আসা মাত্র কঙ্কন হাততালি দিয়ে উঠলো আনন্দে, সকলকে ডেকে ডেকে বললে, দেখ কী সুন্দর আলো! কত হীরে মাণিক মুক্তো!

কিন্তু তা' হলে কি হবে, কামাল ভয় দেখিয়ে বললে, খবরদার,

ও-সব হীরে মানিক ছুঁসনে কঙ্কন, ছুঁলেই পাথর হয়ে যাবি! ও-সব পরীদের কারসাজি।

কামালের সাবধান-বাণীর তোয়াক্কা না করে ওঙ্কার কিন্তু এর মধ্যেই তার হাফপ্যান্টের পকেটটা হীরে-মুক্তোয় ভর্তি করে ফেলে। এখন আর কি করে সে হীরে মানিক নেবে। সে তার বাবাকে বলেছিল তার হাফপ্যান্টে দু'টো পকেট তৈরি করে দিতে। কিন্তু তা' না করে দেওয়ায় বাবার ওপর মনে মনে সে খুবই রেগে গেল।

এদিকে খই মুড়ির মতো চারদিকে হীরে ছড়ানো দেখে ভীত চাকমার মনে হলো ওগুলো নিলে শ্যাওড়া গাছের শাঁকচুন্নিটা ধরবে না তো?

এ সময়েই কল্পনা তার সঙ্গী কিশোরদের জানালো, বড়ো হয়ে তারা এই সাগর জয়ে আসবে এবং যে বীর এই সাগরকে জয় করতে পারবে সেই পাবে সাগর জলের এসব হীরে মুক্তো মানিক। এই আশার বাণী শুনিয়ে সকলকে উদ্দীপ্ত করে নিয়ে কল্পনাদি সেই পুরানো কালের 'সাত ভাই চম্পা' কাহিনীর পারুল বোনের মতো একে একে সঙ্গের চির-কিশোরদের জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলো তারা কে কি হবে। প্রথমেই প্রশ্ন করা হলো কামালকে। উত্তরে সে বললে ঃ

আমি সাগর পাড়ি' দেব, হব সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খী বজরা আমার লাল রাঙা পাল তুলে
ঢেউ-এর দোলায় হাসের মতন চলবে হেলে দুলে।
চার পাশে মোর গাংচিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

এতো গেল কামালের কথা, কিন্তু কিশোর দলের পাণ্ডা কঙ্কনের কি বক্তব্য—সে কি হবে, কল্পনাদির সেই প্রশ্নের উত্তরে সে সুন্দর একটি কবিতায় জানালো ঃ

সপ্ত সাগর আমার হব সিন্ধুপতি
আমার রাজ্যে কর জোগাবে রেবা ইরাবতী।
কত সিন্ধু ভাগীরথী॥
রক্ত-রাঙা পলার দ্বীপে রাজধানী মোর হবে
জয়গান মোর উঠবে নিতুই সাগর রোলের স্তবে।
সপ্তদীপা পৃথিবীরে রইবে সদা ঘিরে
যেন কোলের খোকার মত আমার সাগরনীরে।
সাগর-তলের সপ্ত পাতাল নাই সন্ধান যার
জয় করব, আমি তারে করব আবিষ্কার॥

এর পরেই সাগর জলের শব্দের মধ্যে মনে হলো পুষ্পরথটি যেন ওদের সবাইকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেল। এদিকে ভোর যে হয়ে এসেছে পাখির কলরব থেকেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। এ সময়ে বেণু নামের একটি খুকী এসে ওর কঙ্কনদা ও ওঙ্কারদাকে ডেকে তুললো ঘুম থেকে। বললে, আমরা সমুদ্দুর থেকে উঠে পৃথিবীতে এসে পড়েছি। ঐ দেখ সূয্যি উঠছে।

বায়স্কোপের সূয্যি নয়তো, প্রশ্ন তুললো ওঙ্কার। কল্পনার মায়ার খেলায় সবই হয়তো ভুল দেখছে ওরা। সন্দেহ হলো ওঙ্কারের।

এর মধ্যে বেণুর সঙ্গে বেশ ভাব জমে গেছে কল্পনার। বেণু যে সেখানেই একটা লেপ মুড়ি দিয়ে পড়েছিল তা কল্পনাও আগে জানতে পারেনি। তাই একটু অবাক হয়েই সে বেণুকে বললে, আমরা এখন চাঁদের দেশে, মঙ্গলগ্রহে বেড়াতে যাবো। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? প্রস্তাবটা শুনেই সে আতঙ্কিত হয়ে তাকে 'হেদো'র কাছে নামিয়ে দিতে বললো কল্পনাকে। সেখান থেকে সে বাড়ি চলে যাবে। তার চলে যাওয়ার কথা শুনে ওঙ্কার বেণুকে খুব চেপে ধরলো তার হাফপ্যান্টের পকেটের সব মণিমুক্তো চুরি করেছে বলে। বেণু বললে, সে চুরি করতে যাবে কেন, তার ছেঁড়া পকেট থেকে ওগুলো গলে পড়েছে। সে তুলে নিয়েছে, ওঙ্কারদার বউ এলে মুক্তোর মালা গেঁথে সে তার বৌকে উপহার দেবে।

ভীরু চাকাম আরো মজার কথা বললে। শ্যামবাজারে দোতলা বাস চলতে দেখে সেই বাসের ছাদে ওকে টুপ করে করে ফেলে দিতে বললে। কল্পনা তাকে জবাবে জানিয়ে দিলে যে, ভয়ের মধ্যে রেখেই তার ভয় দূর করা হবে। ভয়-কাতুরেদের জন্যে এটাইতো ঠিক ব্যবস্থা।

এরপর কল্পনা এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে বেণুকে যার ভাবি চমৎকার উত্তর দিয়েছে বেণু। চাঁদা মামা সব শিশুরই প্রিয়। চাঁদের দেশে যাবার ইচ্ছে তাদের সবারই কখনো না কখনো হয়ে থাকে। সেই চিরন্তন ইচ্ছে থেকেই তো মানুষ আজ চাঁদে ঘর বাঁধতে উদ্যোগী হয়েছে। সেই চাদ যতই সুন্দর লাগুক দেখতে, যতই ভালো লাগুক, এই মাটির পৃথিবীর সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা হয়না।

কল্পনা যখন প্রশ্ন করলো, তোমার চাঁদের দেশকে বেশি ভালো লাগে না মাটির পৃথিবীকে, বেণু তখন জোরের সঙ্গেই উত্তরে বললে, আমি এই পৃথিবীকে খুব ভালোবাসি। একে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। ও যেন আমার মা।

এই জবাব পেয়ে কল্পনা জানতে চাইলো এই পৃথিবীতে কী হতে চায় বেণু। উত্তরে সে জানালো :

আমার ইচ্ছা করে আমি হব সকালবেলার পাখী
সবার আগে কুসুমবাগে উঠব আমি ডাকি!
সূয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন' মা বলবেন রেগে।
বলব আমি 'আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাক
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?
আমি যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে'।
উষাদিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড় চূড়ে,
দেখব নীচে ঘুমায় শহর শীতের-কাঁথা মুড়ে।
বলব আমি, 'ভোর হ'ল যে, সাগর ছুটে আয়',

ঝর্ণা মাসি বলবে হাসি, 'খুকি, এলি নাকি ?
বলব আমি, 'নইক খুকী, ঘুম-জাগান পাখী !'

সত্যি সত্যি মেয়েদের তো খুব সকাল সকালই জাগতে হয়। এ একটা সং অভ্যাস বৈ কি। বেণুর ইচ্ছের মধ্য দিয়ে কবি একটি সং শিক্ষার প্রচার করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথ, কিশোর সমাজকে কর্মে দীক্ষা দিয়েছেন কবি।

অভিযানেব একটা উন্মাদনা আছে। তরুণদের মধ্যে সে উন্মাদনা সবচেয়ে বেশি। সময় সময় সেখানে রাশ টানতে হয়। কল্পনাকে তাই করতে হয়েছে এই নাটিকায়।

রথ না থামিয়ে গৌরীশঙ্করের চূড়ায়, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে, নাম-না-জানা নানা দেশে এবং চাঁদের বুকে ও মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাবার জন্য আব্দাব কবলে কঙ্কনকে কল্পনা এই আশ্বাস দিয়েছিল যে, অসীমেব সীমা খুঁজতে—অকুলের কূল দেখাতে তাকে সে নিয়ে যাবে কিন্তু পৃথিবীর কাজ তাকে আগে সেরে নিতে হবে। পৃথিবীতে কী সে করবে কল্পনা তা জানতে চাইলে কঙ্কন বললে, সে গাইবে গান আর এই পৃথিবীর সবাই তার ধুয়া ধববে। এই বলে সে অতি বিখ্যাত সেই গানটি গাইতে আরম্ভ করে দিলে :

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল···

গান থামিয়ে দিয়ে কল্পনা এক কঠিন প্রশ্ন এবার জিজ্ঞেস করলো কঙ্কনকে, তুমি কি শুধু গানই গাইবে, কোনো কর্ম করবে না ?

সে প্রশ্নে যেন জ্বলে উঠলো কঙ্কন। সে বলতে লাগলো, কর্মই তো আমার জীবন। কাজ করি বলেই তো রাত পোহায়।

এই বলেই সে কি হবে এক কবিতায় তার বর্ণনা দিতে শুরু করলো :

আমি হব দিনের সহচর—
বলব 'ওরে রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে কর্।
তোদের ছেলে উঠল জেগে, ঐ বাজে তার বাঁশী,
জাগলো দুলাল বনের রাখাল, ওঠরে মাঠের চাষী।

'শ্যাওলা' 'হাসা' দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে—
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটির কাগজ খুঁড়ে
লিখব সবুজ-কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি
ওপর হতে করবে আশীষ দীপ্ত রাঙা রবি।
ধরায় ডেকে বলব 'ওগো শ্যামল বসুন্ধরা
শস্য দিও আমাদের এবার আচল-ভরা।
জংলী মেয়ে ছিলে তুমি, ছিলনাক ছিরি
মরুর বুকে থাকতে শুয়ে ফিরতে দরী-গিরি।
আমরা তোমায় পোষ মানিয়ে দিয়েছি ঘর বাড়ী
গা ভরা তোর গয়না মাগো, ময়নামতীর শাড়ি!
জংলা কেটে ক্ষেত করেছি, ফসল সেথা ফলে,
পাহাড়ে তোর বাংলো তুলে দ্বীপ রচেছি জলে।
বন্য মেয়ে! আমরা তোরে করেছি রাজরাণী,
ধুলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসনখানি।
খামার ভরে রাখব ফসল, গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায়-কাতর ভাইগুলিকে আমি দেব প্রাণ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চিব-তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা॥

এই মাটির রাজা মাঠের কবিই আমাদের কবি যিনি এত অপূর্ব কবিতাটি বাঙলার কিশোরদের হাতে তুলে দিয়েছেন এই নাটিকার মাধ্যমে। এই স্বপ্ন নাটিকায় দেখানো হয়েছে, চাকাম ফুসফুস ভয়ে আতঙ্কে পুষ্পরথ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হেঁদোর জলে আর বেণু চিৎকার শুরু করেছে তার সব মণি মুক্তো চাকাম চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল বলে। কল্পনা হাসতে হাসতে বললে, চাকামের জন্যে কোনো ভয় নেই, সে সাঁতার কেটে ঠিক বাড়ি চলে যাবে, তবে সে যাবে আর কোথায়, আমার কাছে আসতেই হবে আবার অর্থাৎ স্বপ্ন দেখতেই হবে এবং কল্পনার আশ্রয় তাকে নিতেই হবে। বেণু মণি-মুক্তো হারিয়ে কাঁদছিল। তাকে কল্পনা বললে, যেদিন তোমার দাদারা সত্যি সত্যি

সাগর অভিযানে বেরিয়ে সাগর জয় করবে তোমাদের সাহায্যে সেদিনই তোমরা সত্যিকারের মুক্তো-মানিক কুড়িয়ে আনতে পারবে, এতো শুধুমাত্র কতগুলি ঝিনুক কুড়িয়ে এনেছিলে।

এদিকে কঙ্কন ধরেছে কল্পনাকে, সবাইকে নামিয়ে দিয়ে সে যেন শুধু তাকে নিয়ে চাঁদের দেশে যায় যেখান থেকে পৃথিবীতে অমৃত নিয়ে এসে সে জরা-মৃত্যু জয় করে সুন্দর চির-কিশোরের পৃথিবী তৈরি করবে। অপূর্ব আকাঙ্খা।

তখনি তার ঘুম ভেঙে যায়, ওড়িয়া ভৃত্যের ডাকে।

এতক্ষণের আলোচনায় বুঝতে নিশ্চয়ই কারো বাকি নেই আমাদের এই কবি-নাট্যকার ও গীতিকার অন্য কেউ নন, তিনি নিশ্চয় বাঙলার শ্রেষ্ঠ খোয়ালী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যিনি পরবর্তী কালে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যায় যথার্থ ভাবেই ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি একাধারে খেয়ালী কবি ও বিদ্রোহী কবি, তিনি কবি-সৈনিক এবং ভক্ত গীতিকবি। এমন কবির লেখক-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধেও ছোটবড়ো সবারই নানা তথ্য জানা থাকা দরকার।

বাঙলার কবি বাঙালী কবি হলেও কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ব পুরুষের বাস ছিল পাটনার নিকটবর্তী হাজীপুর গ্রামে। তাঁরা মোগল বাদশাদের সরকারে চাকরি করতেন। সম্রাট শাহ আলমের আমলে ওরা চলে আসেন বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম, একদা রাজা নরোত্তম দাসের রাজধানী বলে পরিচিত চুরুলিয়ায়। রাজা নরোত্তম দাসের কালে রাজধানীর নাম ছিল চুরুলিয়াগড়। সেখানকার তৈরি বিখ্যাত অস্ত্রশস্ত্র কিনতে আসতো আশপাশের নানা ছোটবড়ো রাজ্য থেকে যত সব সৈন্যসামন্তরা।

সে জন্যেই কি জন্ম থেকেই নজরুলের মধ্যে একটা সৈনিক বৃত্তির মোহ লুকনো ছিল? কাব্য প্রতিভাও নজরুল পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। পিতা কাজী ফকির আহম্মদের ছিল ফারসী ও বাংলা কাব্যে গভীর জ্ঞান ও আগ্রহ এবং বাংলা-আরবি-ফারসী জানা এক চাচা

কাজী বজলে করিমও ছিলেন সত্যি সত্যি একজন কবি। কবিতা রচনার প্রথম পাঠ নজরুল নিয়েছিলেন এই কাকার কাছে।

কিন্তু এই কাজী উপাধিটি এলো কোথা থেকে? এও বংশ পরম্পরায় পাওয়া একটি সম্মান-চিহ্ন যা এ বংশের প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামের সঙ্গে একেবারে নামের আদিতে ধারণ করে আসছেন চুরুলিয়ায় আগত তাঁদের প্রথম পূর্ব পুরুষ থেকে। মোগল শাসনকালে এই চুরুলিয়া গ্রামে ছিল মোগলদের এক বড়ো বিচারালয় এবং সেই বিচারালয়ের এক বিচারকের অর্থাৎ কাজীর পদ নিয়ে প্রথম এখানে এসেছিলেন খেয়ালী বিদ্রোহী কবি নজরুলের এক পূর্ব পুরুষ। কাজী বলেই ছিল তাঁর মূল পরিচয় এবং সেই থেকে তাঁর বংশধরেরা সকলেই কাজী বলে পরিচিত হয়ে আসছেন।

সেই বংশেরই কাব্যোৎসাহী কাজী ফকির আহম্মদ সাহেবের ঘর আলো করে এক শিশু-সূর্যের আবির্ভাব ঘটলো ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে। দুঃখের পরিবেশে জন্ম বলে শিশুটির ডাক নাম 'দুখু' রাখা হলেও, সূর্যের মতোই প্রখর তেজ বিকিরণ করে এক যাযাবর পথচারীর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন কবি-সৈনিক নজরুল ইসলাম। তিনি নিজেই তাঁর রচিত 'পথচারী' কবিতায় লিখে রেখে গেছেন:

> কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
> দু'ধারে দু'কূল দুঃখ-সুখের—মাঝে আমি স্রোত বারি।
> আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হ'তে
> বিরাম বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আন্ পথে।

এই পুত্ররত্নকে পাওয়ার পূর্বে পর পর চারটি ছেলেকে অকালে হারিয়ে কাজী ফকির আহম্মদ মোটেই নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারেন নি। এই ধর্মভীরু মুসলমান ফকির সাহেবের কেবলি মনে হতো তাঁর এই সুলক্ষণযুক্ত ছেলেটিও কখন না জানি তাঁদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে। মা জাহেদা খাতুনও এমনি দুশ্চিন্তায়ই নিমগ্ন থাকতেন। এই ছেলের কল্যাণে ফকির সাহেব কাজী ফকির আহম্মদ সব কাজীর

কাজী খোদাতাল্লার কাছে এবং তাঁর বাড়ির দক্ষিণের পীরপুকুরের পীর হাজী পালোয়ানের কাছে দিনরাত আকুলভাবে প্রার্থনা জানাতেন, এই শিশুটিকে রেখেই যেন পৃথিবীর মাটি থেকে তিনি বিদায় নিতে পারেন। আল্লা তাঁর প্রার্থনা শ্রবণ করেছিলেন। সুস্থ সুপুরুষ ফকির সাহেব নজরুলের জন্মের ৮ বছর ১০ মাসের মধ্যে পরলোকগমন করেন এবং কবির মাতৃবিয়োগ ঘটে ১৩০৫ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ।

পিতার মৃত্যুর পরেই নজরুলদের সংসারে দারুণ আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়। সেই সঙ্কট উত্তরণে বালক কবি যে ভাবে সংসার তরণীর হাল ধরেছিলেন সে সত্যি সত্যি এক চমকপ্রদ কাহিনী। আর সে কাহিনীকে ভালো করে বুঝতে হলে কবির বাড়ির ধারের সেই পীরপুকুরের পীরের কাহিনীটুকু জেনে নেওয়া দরকার। সেও কম চাঞ্চল্যকর নয়।

সেই হাজী পালোয়ানের আকর্ষণে বালক-কবি যে কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর সে সময়ের কথার মধ্যেই সে পরিচয় রয়ে গেছে। তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বলতেন যে, হাজী পীর প্রায়ই তাকে দেখা দেন এবং তার কথাও তিনি মাঝে মাঝেই শুনতে পান। এই হাজী আর কাজী একাকার হয়ে গিয়েছিলেন কবি জনক ফকির আহম্মদের সময় থেকেই।

হাজী পালোয়ানের পুরানো সব বৃত্তান্ত শুনে কাজী ফকির আহম্মদ এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সে ধারণা এই, যিনি সব মানুষের জন্যে এমনি করে ভাবেন তিনি পরম স্রষ্টা খোদারই দূত। তাঁকে আশ্রয় করে থাকতে পারলে কোনো ভয়কেই আর ভয় করতে হবে না। বাস্তবিকই এক সময়ে ফকির সাহেব ঘর ছেড়ে এসে পীর-পুকুর পারের জীর্ণ মসজিদকেই তাঁর জীবনের প্রধান আশ্রয় করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু কে এই হাজী পালোয়ান? ইনিও চুরুলিয়া গ্রামেরই ছেলে। অনেক কাল আগে তিনি জন্মেছিলেন এই পুণ্য মাটিতে। একই করুণা-

ময়ের সৃষ্টি মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ থাকতে পারে, এ তিনি বিশ্বাস করতেন না। সব মানুষের সেবাই আল্লার কৃপা লাভের সহজ উপায়, এই ছিল তাঁর কথা।

ইয়া তাগরাই চেহারা, তেমনি বলিষ্ঠ মন। সেই জন্যে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল হাজী পালোয়ান।

তাঁর নিজ গাঁয়ের মানুষের দুঃখ দেখে দেখে বড়োই কাতর হয়ে পড়েছিলেন কিশোর হাজী। জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে কখনো? গ্রীষ্মের দিনে একটু পানীয় জলের জন্যে গাঁয়ের মেয়ে-মরদ সবাইকেই এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে হয়। কেউ একটু আধটু পায়। কেউ পায় না। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। তাই একদিন হাজী পালোয়ান ঈশ্বরের নামে কঠোর প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—এ গাঁয়ের মানুষের জলকষ্ট নিবারণে এখানে একটা পুকুর আমাকে করতেই হবে।

কথাটা রটিয়েও দিলেন হাজী সাহেব গ্রামের সর্বত্র। গ্রাম-বাসীরা অবাক হয়ে যায় ছেলেটির কথা শুনে। হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে। তারা বলাবলি করে, কোথায় হাজীর টাকাপয়সা যে একটা পুকুর কাটা.না সম্ভব হবে? ব্যাপারটা কি এত সহজ?

হ্যা, খুবই সহজ? এসব সমালোচকরা জানে না, মানুষের জন্যে যাদের হৃদয়ে করুণাধারা বয়ে চলে, ভালোবাসায় অন্তর যাঁদের ভরপুর —তাঁরা সেই করুণা ও ভালোবাসার অসীম শক্তিতে শক্তিমান হয়ে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারেন। টাকা পয়সার শক্তি সেখানে নিতান্তই তুচ্ছ।

সে প্রমাণ রাখলেন হাজী পালোয়ান। ঈশ্বরের নামে মানুষের নামে শপথ নিয়ে হাজী একদিন তাঁর কঠিন প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্রতী হলেন। কোদাল ধরলেন নিজের হাতে। অপরিসীম পরিশ্রমে দিনরাত কোদাল চালাতে চালাতে, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে, অনেক গভীরে স্বচ্ছ পানীয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। এবার আরো দ্রুত পুকুর কাটাও শেষ হলো।

হাজী পালোয়ানের আর আনন্দ ধরে না। তাঁর দু'চোখের

আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো মাটির নিচের সেই মন্দাকিনীতে আর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকলেন, হে প্রভু, আলো-বাতাসের মতো মানুষের সেবায় জলও তো তোমারই দান। তোমাকেই আমি এ পুকুরটি উৎসর্গ করে ধন্য হলাম। তোমার এই দানে আমার গাঁয়ের মানুষদের জীবন রক্ষা পাবে বুক-ফাটা তৃষ্ণায়।

পুকুরটিকে আল্লার নামে উৎসর্গ করা হলেও গ্রামবাসীরা তার পীরপুকুর নামকরণ করে পীর হাজী পালোয়ানের নামটিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন।

মানুষের দুঃখে সদা কাতর ও মানুষের কল্যাণে সদা তৎপর এই পীরের জীবনকথায় এমনি আকৃষ্ট বোধ করতেন নজরুল জনক যে, মাঝে মাঝেই তিনি বাড়ি থেকে ছুটে ছুটে যেতেন সেই পীরের নামাঙ্কিত পীরপুকুরে এবং তার পবিত্র নির্মল জলে পূর্ব তীরবর্তী মসজিদের ছায়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। তাঁর মনে হতো ঐ পুকুরে এবং ঐ মসজিদেই হাজী পালোয়ান অবস্থান করছেন। সেই অনুভূতি থেকেই ধর্মপ্রাণ কাজী আহম্মদ সাহেব এক সময়ে পীর-পুকুরের পাড়ের ঐ মসজিদে এসে দিনের পর দিন কাটাতে থাকেন। বিষয় সম্পত্তি ও সংসারের দিকে তাঁর আর তেমন কোনো নজরই ছিল না সে সময়ে। তারপর একদিন আট বছর নয় মাসের ছেলের ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে তিনি চিরবিদায় নিলেন।

হ্যাঁ, ঠিক ন'বছরেও পা পড়েনি তখন কাজী নজরুল ইসলামের। মা তাঁর দিশেহারা। মায়ের মুখের কালিমা শিশু নজরুলকে ব্যথিত করে। ছোট ছোট তিনটে ভাই ও দু'টো বোন। বাবার অবর্তমানে তাঁকেই তো মা ও ভাইবোনদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু সে দায়িত্ব নিতে হলে তো লেখাপড়া কিছু শেখা দরকার। মক্তবে পড়তে হলে তো মাইনে লাগবে। মা কোথা থেকে মাইনে দেবেন? কাজেই মক্তবে ভর্তি হবার ইচ্ছে মায়ের কাছে প্রকাশই করবেন না, মনে মনে ঠিক করে ফেললেন নজরুল। ভর্তি হতে চাইলে মা যে ভীষণ দুঃখ পাবেন ছেলের ইচ্ছে পূরণ করতে না পেরে। তা ভেবেই

ঘরেই পিদিমের তলায় বসে খুব মন দিয়ে পড়শুনো করতে লাগলেন নজরুল। দিনের বেলার অধিকাংশ সময়ই তাঁর কাটতো প্রধানত দস্যিপনায়। মাকে উৎফুল্ল রাখার জন্যে ও ভাইবোনদের খুশী রাখতে কখনো অট্টহাসিতে আবার কখনো বা নাচেগানে হৈ-হুল্লোড়ে সারা বাড়ি মাতিয়ে তুলতেন। আসলে এটা ছিল অভাবের অন্ধকারকে চেপে রাখার চেষ্টা।

এর মধ্যে পিতৃহারা বালক নজরুলকে গাঁয়ের লোকেরা সবাই সত্যি সত্যি 'দুখু' বলেই ডাকতে শুরু করেছে। সকলেরই কেমন একটা সহানুভূতির চোখ পড়েছে তাঁর ওপর। এমন ছেলেকে ভালো না বেসে পারে কেউ? ডাগর ডাগর চোখ এবং তার সঙ্গে নাক-মুখের কমনীয় লালিত্যে কী অপূর্ব চেহারা তাঁর! তার ওপর অটুট স্বাস্থ্য ও সুস্থতা তাঁকে প্রচুর শক্তিরই শুধু অধিকারী করে নি, তাঁর সৌন্দর্যকেও অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বাল্যে খেলাধুলায় ও মারামারিতে কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো না, সবাইকেই পরাজয় মানতে হতো তাঁর কাছে। অন্য দিকে গান-কবিতা ও ছড়া রচনায় এবং গাইবার ও কণ্ঠকণ্ঠে আবৃত্তি করার যে ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিয়ে ছিলেন সেই ছেলেবেলায় তাতে দূর দূরান্তের গাঁয়ের মানুষও তাঁর দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি।

ও দিকে গাঁয়ের মক্তবে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় গিয়ে বসলেন নজরুল এবং বেশ ভালো নম্বর পেয়েই পাশ করলেন। তখন আর কতটুকু বয়স তাঁর? মাত্র দশ বছর। পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মক্তবেই একটা শিক্ষকতাও জুটিয়ে নিলেন তিনি অনেক চেষ্টায় অনেক কষ্টে।

শুধু তাই নয়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধর্ম ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলেন নজরুল এবং তাঁর বাবার অতিপ্রিয় মসজিদের ও হাজী পালোয়ানের মাজারের (কবর) খাদেম অর্থাৎ সেবক হলেন। এ সময়েই নাকি তিনি হাজীর দর্শন পেতেন ও তাঁর কথা শুনতে পেতেন হাজী সাহেবের মাজারে।

দুখু মিঞা মসজিদে যখন এমামতি করতেন তাঁর সেই ধর্মব্যাখ্যা

শুনে দশগাঁয়ের গুণী-জ্ঞানী বৃদ্ধরাও মুগ্ধ হতেন এবং বিস্মিত হয়ে যেতেন। মানব-ধর্মের ভিত্তিতে পবিত্র কোরাণ-হাদিসের এ যে অভিনব অপূর্ব বিশ্লেষণ! আর ঐটুকু বয়সে এমন ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠার দৃষ্টান্তও বিরল। এও তুখুব লোকান্তরিত পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া। কে হিন্দু কে মুসলমান, ওতো হলো বাইরের পরিচয়—মানুষকে সব সময়ই মানুষ হিসাবেই জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং ভাবতে হবে। এ পরম শিক্ষা তিনি প্রথম পেয়েছিলেন তাঁর পিতা ফকির আহম্মদ ও ধর্মগুরু পীর হাজী পালোয়ানের জীবন থেকে। পরবর্তী কালে এ শিক্ষারই স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে তাঁর বিখ্যাত সব গানে ও কবিতায় যেখানে তিনি কি হিন্দু কি মুসলমান সমস্ত ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের কঠিন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছেন। 'মানুষ' কবিতায় কবি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন :

গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নহে, নহে কিছু মহীয়ান।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরিচালিত তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় অধার্মিক মোহান্ত সতীশ গিরিকে গদীচ্যুত করার আহ্বান জানিয়ে কবি নজরুল লিখেছিলেন তাঁর রচিত 'মোহ অন্তের গান'টিতে :

এই সব ধর্ম ঘাগী
দেবতায় করছে দাগী
মুখে কয় সর্বত্যাগী
ভোগ নরকে বসে...

নজরুলের এই ধর্মপ্রাণতা ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সত্যদৃষ্টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর 'বিষের বাঁশী' কাব্য-সংকলনের 'সত্যমন্ত্র' গানে। তাতে তিনি লিখেছেন :

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক।
এই খোদার উপর খোদকারী তোর
মানবে না আর সর্বলোক!!

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য
অধিক সত্য প্রাণের টান
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।

এবং শেষ পর্যন্ত তিনি লিখলেন :

হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম্, ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে 'মানুষ' সন্তান মোর মা'র।

সব মানুষই মায়ের সন্তান হয়েও যে ধর্মীয় ভেদাভেদের ফলে ডুবতে বসেছে, ধর্মের মূল ভিত্তি মানবতার এই দৃষ্টিভঙ্গির বীজ কবির অন্তর্লোকে উপ্ত হয়েছিল একেবারে ছোট বেলাতেই।

বয়েস তখন তাঁর আট বছরের মতো। বাবা বেঁচে আছেন, তবে প্রায় সংসারত্যাগী। সারাটা দিনই এক রকম পীর হাজী পালোয়ানের মাজারে ও মসজিদেই সেবায় ও প্রার্থনায় তিনি কাটিয়ে দেন। এদিকে তাঁর প্রাণের প্রাণ দুখু ছেলের দুর্দান্তপনায় যে সারা গ্রাম তোলপাড়, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি দেবারও অবকাশ নেই। সেই দুরন্ত ছেলেই যে আবার ধর্মের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে গাঁয়ের মৌলভী কাজী ফজলে আহম্মদের বিশেষ নজরে পড়ে গিয়েছেন, সে খবরও কি দুখুর বাবা ভালো করে রাখতেন ?

যাক সে কথা। মৌলভী সাহেবের প্রিয় পাত্র হয়ে তাঁর কাছ থেকে দুখু বিদেশী ভাষা হলেও আরবি-ফারসী অতি সহজেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। কিছু কিছু আগেই শিখেছিলেন তাঁর চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে। এবার মৌলভী ফজলে আহম্মদের কাছে কোরাণ আবৃত্তি করার রীতি তিনি এমনি সার্থকভাবে শিখে নিলেন যে, একবার একদল বিদেশী মৌলভী এসে দুখুর কোরাণ আবৃত্তি শুনে তাঁকে প্রচুর বাহবা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে কোরাণ বোধ হয় এর মতো ছেলের জন্যেই লেখা। শিশু নজরুল সম্বন্ধে তাঁরা এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও নাকি করেছিলেন যে এ ছেলে দেশের এক সেরা মানুষ হবে।

যাই হোক পিতৃবিয়োগের পর সংসার পরিচালনায় মাকে যথাসাধ্য

সাহায্য করলেও বালক নজরুল তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি। আরো বেশি করে রোজগারের এবং দুঃখ-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভের পথ যেন আপনা থেকেই ধীরে ধীরে তাঁর সামনে উন্মুক্ত হতে লাগলো। তবু দারিদ্র্য ঘোচে না। দারিদ্র্য কবির জীবনের প্রায় চিরসাথী হলেও দারিদ্র্যকে তিনি মহান বলেই মনে করেছেন। পরবর্তী জীবনে তাইতো কবি লিখতে পেরেছেন :

> হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান্
> তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
> কণ্টক মুকুট শোভা। দিয়েছ তাপস,
> অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ; ..

এক বছর ধরে মক্তবে শিক্ষকতা করার সময়ের মধ্যেই চুরুলিয়ার সব মহলেই জানাজানি হয়ে গেছে যে দুখু মিঞা নজরুল বেশ পদ্য এবং গান রচনা করেন। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ছড়া ও গানের খুবই কদর হলো কিছু দিনের মধ্যে এবং তিনিই ঐ অঞ্চলের সেরা কবি বলে স্বীকৃতি পেলেন।

সে যুগটা ছিল যাত্রাগান, কবিগান, পাল কীর্তনের যুগ। গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষরা দল বেঁধে সে সব গানের আসরে যেয়ে ভিড় জমাতো, নাচগান-বাজনায় মগ্ন থেকে শেষে রাত কাবার করেই হয়তো বাড়ি ফিরতে হতো। বীরভূম ও চুরুলিয়া অঞ্চলে আরেক ধরনের গানও ছিল খুবই আকর্ষণীয়, তাকে বলা হতো লেটোগান। তাঁর ছড়া, কবিতা ও গানের প্রশংসা যখন দশ গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তখন দুখুর বন্ধুবান্ধবরাতো বটেই তাঁর অনেক অভিভাবক স্থানীয় পল্লী-মোড়লদের পক্ষ থেকেও তাঁকে উৎসাহিত করা হতে থাকলো একটা লেটোর দলে যোগ দেবার জন্যে।

পরামর্শটা মন্দ নয়। কিছু বেশি পয়সা উপায় তো করা যাবে এবং মাকে কয়েকটা বেশি টাকা দেওয়া যাবে সংসার চালাবার জন্যে। সব সময় মায়ের কষ্ট লাঘবের চিন্তা। সব দিক ভেবে দুখু শেষ পর্যন্ত লেটোর দলেই যোগ দিয়ে বসলেন এগার বছর পার না হতেই।

প্রথম দিনেই একেবারে বাজীমাৎ। আসরে নেমেই নজরুল স্বরচিত কয়েকটি গ্রাম্য গাঁথা এমন দরদ দিয়ে দরাজ গলায় নেচে নেচে গাইলেন যে গোটা আসর শেষ পর্যন্ত একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকলো।

প্রথম দিকে লেটোর দলে শুধু গান গাইলেও পরে তিনি গানের শিক্ষকতাও করেন এবং এমন কি দলের ওস্তাদও নির্বাচিত হন। এই ওস্তাদকে নিয়ে কী সোরগোল তখন লেটো মহলে! ঐ বয়েসেই তিনি যেন এক বিশ্বজয়ী পুরুষ!

কিন্তু তা হলে কি হবে, চারটি বছর লেটোর দলে কাটিয়ে কিশোর কবির মনটা কেমন ঘুরে গেল। তাঁর ইচ্ছে হলো আবার স্কুলে ভর্তি হয়ে আরো কিছু লেখাপড়া করাব। কিন্তু এর মধ্যেই লেখাপড়া কি তিনি কম করেছেন? জানবার অসীম আগ্রহ থেকে অল্প বয়েসেই ফারসী ও বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি যেমন বহু ইসলামী ও হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তেমনি নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখে নিয়ে প্রাচীন গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশের নানা উপকথা-ইতিকথাও আযত্ত করেছিলেন। লেটোর দলের জন্যে তিনি যে সমস্ত পালা, ছড়া, গান ও কমিক ইত্যাদি রচনা করেন তাতেই নজরুলের আত্মপ্রয়াসী শিক্ষায় লব্ধ জ্ঞানের ব্যপকতার পরিচয় মেলে।

কবিগানের মতো লেটোগানও আরম্ভ করা হয় বন্দনা গান দিয়ে। লেটোর দলে গাইবার জন্যে নজরুল যে উর্দু-বাংলা বন্দনা গানটি রচনা করেছিলেন তা এই :

সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো 'বারিতালা'
তারপর দরূদ পড়ি মোহাম্মদ 'সল্লে আলা'
সকল পীর দেবতা কুলে
সকল গুরুর চরণ মূলে
জানাই সালাম হস্ত তুলে
'দোওয়া' কর তোমরা সবে হয় যেন গো মুখ উজলা
সর্বপ্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো 'বারিতালা'।
তোমারই ওগো খোদাতালা।

চাপান দেওয়ার যেমন রীতি রয়েছে কবিগানে তেমনি লেটোগানেরও সেটা একটা বৈশিষ্ট্য এবং চাপান গান রচনায় ও গাওয়ায় নজরুল ছিলেন মস্ত ওস্তাদ। এই চাপানটাই লেটোগানের আসল আকষণ। তেমনি একটি আকর্ষণীয় চাপান গানে নজরুল বলছেন বিরুদ্ধ পক্ষকে লক্ষ্য করে :

পাল্লা সাথে লেটোর ল্যাঠা লাগল,
ছড়াদার ও দোঁহাররা সব ভাগল
ওদের ছন্দ সুরের মিল নেইক গানেতে
ও মিঞার জ্ঞান নেইক তানেতে
(ওদের) মাটির সাথে 'আকড়া' মিশাল ধানেতে
ষাঁড়ের সাথে গাধা বাঁধা থানেতে
দেখে ইহা ভদ্রলোকে রাগল
(ওদের) ছড়াদার ও দোঁহাররা সব ভাগল।

এমন মজাদার চাপান গানে শ্রোতারা তো মজে যাবেনই। আরো কিছু মজার চাপান গান রয়েছে নজরুলের যেখানে তিনি নানা ভাষা মিশিয়ে গান তৈরি করেছেন। তেমনি একটি নমুনা-গানে কবি বিরোধী পক্ষকে চাপান নিক্ষেপ করে বলছেন ঃ

ওহে ছড়াদার, ওহে হ্যাট পাল্লাদার
মস্ত বড় ম্যাড
চেহারাটা মান্‌কি লাইক
দেখতে ভেরী ক্যাড
মান্‌কি লড়বে 'বাববকী' সাথ
ইয়ে, বড়া তাজ্জব বাত্‌
জানে না ও ছোট হলেও
হামভি লায়ন ল্যাড
শুন ও ভাই ব্রাদার দোঁহারগণ
'মচ্ছড়' ছানারা সব করিয়াছে পণ
গান গাইবে আসর মাঝে
খবর বড় স্যাড

এ গান শুনে হাসি না এসে পারে? কমিক গান অবশ্য হাসাবার জন্যেই। বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত একটি কমিক গানে নজরুল ইসলাম তাঁর নিজের নাম উল্লেখ করেই বলছেন ঃ

রব না কৈলাসপুরে আই এ্যাম ক্যালকাটা গোয়িং
যত সব ইংলিশ ফেসেন আহা মরি, কি লাইট্নিং।
ইংলিশ ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার,
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার,
কামন ডিয়ার গুড্ মর্নিং ॥
বন্ধু আসিলে পরে,
হাসিয়া হেণ্ড শেক করে,
হোল্ডিং আউট এ সিটিং ॥
তারপর বন্ধু মিলে
ড্রিঙ্কিং হয় কৌতুহলে
খেয়েছে সব জাতিকুলে
নজরুল ইসলাম ইজ টেলিং

এমনি ভাবে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে কষাঘাত করে আরো কয়েকটি গান নজরুল রচনা করেছিলেন তাঁর লেটোর দলের জন্যে। 'শকুনি বধ' পালায় একটি গানে অপর পক্ষকে কবি এমনি তাচ্ছিল্য করেছেন যে তারপরে বিরোধী দলের আসরে থাকাই একটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। গানটি নজরুল শুরুই করেছেন এই বলে ঃ

শিবা হ'য়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ
জ্ঞান নাই কি তোর কাণ্ডাকাণ্ড
হয়েছিস উন্মাদ।

নজরুল রচিত আরেকটি নামকরা পালাগান 'চাষার সং'। সে পালার 'বানর মারার দলের গান'টির প্রথমাংশ প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় 'চাষার সং' পালাটি গাঁয়ের চাষীদের স্বার্থে তাদের সমস্যা নিয়েই লিখিত। তাই চাষ-আবাদ নিয়েই

এ পালার জন্যে কবি কয়েকখানি সুন্দর গান রচনা করেছেন স্বভাবতই যেগুলি গ্রামেব চাষী গৃহস্থদের মধ্যে খুবই উন্মাদনা জাগিয়েছে। 'জমিন আবাদের গান'টিতে তিনি বলেছেন :

জীবন যাপন করিতে
চাষ কর বিধি মতে
রবে যদি সুখেতে
এই পৃথিবী মাঝার ॥
লাগাও ধান প্রধান ফসল
তরকারী আর কলাই সকল।
দাও সময় মত জল
যাতে প্রাণ বাঁচে তাহার ॥
অরি হতে ফসলে
রক্ষা কর সকলে
নজরুল এসলাম বলে
নইলে বাঁচা হবে ভার ॥

গৃহস্থ ঘরের তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে গাঁয়ের চাষীর সুখে থাকার উপায় উদ্ভাবন করে এই যে গান বেঁধেছেন লেটো দলের জন্যে এ থেকেই বুঝতে পারা যায় ঐ বয়েসেই তিনি কত গভীরভাবে ভাবতেন গরীব চাষী শ্রেণীর জন্যে। নজরুল-সাহিত্যে কৃষক ও রাখালদের জন্যে কবির একটা বিশেষ দরদ লক্ষ্য করা যায়। 'জাগো সুন্দর চির-কিশোর' নাটক নিয়ে প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবু এ নাটকের দু'টি মূল চরিত্রের মুখ দিয়ে এমন কথা বলানো হয়েছে যা থেকে চাষী-দরদী নজরুলের রূপটি চোখের সামনে ফুটে উঠবে। নাটকের অন্যতম চরিত্র ওঙ্কার বলছে :

...আমার রাজা-টাজা হওয়া পোষাবে না।
ও ঝক্কির চেয়ে অনেক ভাল—
আমি হব রাখাল ছেলে।

আঁচল ভরে মুড়ি নেব হাতে নেব বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
বাছুরটিরে কোলে করে পার হব বিলখাল
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল।
আমি হব রাখাল রাজা মাঠের তেপান্তরে
ছাতিম তরু ধরবে ছাতা আমার মাথার 'পরে।
শালের পাতায় মুকুট গড়ে পরিয়ে দেবে তারা
সিংহাসনে পাতবে এনে নবীন ধানের চারা।
সন্ধ্যা হলে বাজিয়ে বেণু গোঠের ধেনু লয়ে
ফিরব ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হ'য়ে '

আর এই নাটকের অপর প্রধান চরিত্র কঙ্কন কি বলেছে ? তার কথা ঃ

আমি হব দিনের সহচর—
বলব 'ওরে রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে ধর

. ...

খামার ভরে রাখব ফসল, গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিকে আমি দেব প্রাণ।
এই পুরাতন পৃথিবীকে রাখব চির-তাজা
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা॥

চাষীদের মহৎ ভূমিকাকেই কবি এ দুটি কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রায় বছর এগারোর মতো বয়েসে লেটোর দলে যুক্ত হয়ে গান রচনায় ব্রতী হয়ে ধীরে ধীরে ওস্তাদের পদ লাভ করলেও সংসারের নিদারুণ দারিদ্র্য ঘোচানো তাতে সম্ভব নয় দেখে লেটোর দলে যোগ দেবার কিছুকাল পরেই নজরুল কাউকে না জানিয়ে গ্রাম ছেড়ে আসানসোল শহরে সহসা চলে এলেন। সেখানে আট টাকা (অন্য মতে পাঁচ টাকা) মাস মাইনেতে চাকরি নিলেন এক রুটিওয়ালার দোকানে রুটি তৈরির কাজে। ভীষণ পরিশ্রমের কাজ। আর মালিকও বড়ো কড়া। পড়াশুনা করা, গান গাওয়া এবং গান ও কবিতা রচনা করা চলবে না দোকানে বসে কাজের সময়ে। কবির কী শাস্তি !

নিজের গ্রামে থাকতে দুখু ভয়ংকর রকমের দুষ্টুমি করতেন বলে গাঁয়ের লোকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন এবং পড়ার দিকে তাঁর ঝোঁক লক্ষ্য করে তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে তাঁকে রানীগঞ্জের কাছে সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ পাহাড়ী অঞ্চলের নিষ্করুণ পরিবেশে কবির মন টিকলো না। সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি ভর্তি হলেন কবি কুমুদরঞ্জনের মাথরুন বিদ্যালয়ে। কিন্তু সেখানেও নজরুল মন বসাতে পারছিলেন না, বার বারই তাঁর মায়ের করুণ মুখ-খানি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো। তাই ক্লাস সেভেনে পড়তে পড়তে সে স্কুলও ছেড়ে দিয়ে তিনি মায়ের কাছে চলে এসেছিলেন।

সেখানে সংসারের দুঃখ সহ্য করতে না পেবে আসানসোলে পালিয়ে গিয়ে রুটির দোকানে চাকরি নিয়ে মালিকের কঠিন আচরণের যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করলেন তাতে নজরুলকে হাঁপিয়ে উঠতে হয়েছিল। মালিকের কঠোরতায় দিনে লেখাপড়া বা গান করতে না পারলেও রাত জেগে লিখতে পড়তে বা ছড়া-গান রচনায় কে বাধা দেবে তাঁকে? এভাবেই তিনি দিনে রুটিওয়ালার চাকরি আর রাতে লেটোর দলে গান গেয়ে কাটালেন কিছুকাল। প্রায় চারটে বছর এমনি দুঃখকষ্ট ও অসম্ভব পরিশ্রমের মধ্যে কাটিয়ে কবি যখন চিরতরে লেটোর দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এলেন তখন দলের সবার মধ্যে যে বেদনার সঞ্চার হয়েছিল তা' ধরে রাখা হয়েছে ওদেরই একটি গানে। ওস্তাদ নজরুল দল থেকে বেরিয়ে এলে ওরা এ গানটি গেয়েছিল :

আমরা এই অধীন, হয়েছি ওস্তাদহীন
ভাবি তাই নিশিদিন বিষাদ মনে।···

এদিকে এক অবাক কাণ্ড ঘটে বসলো। অনেকদিন ধরেই দুখু মিঞা আসানসোলে মনমরা হয়ে রুটির দোকানে চাকরি করে চলেছেন। হঠাৎ একদিন সেখানকার দারোগা কাজী রফিজুদ্দিন সাহেব দুখুর প্রতিভাদীপ্ত চেহারায় এমনি আকৃষ্ট হলেন যে ঐ অভাবী বালক কবির সঙ্গে আলাপ করতে করতে তিনি তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে

উঠলেন। সেই ঘনিষ্ঠতা থেকেই দারোগা সাহেবের জানা হয়ে গেছে যে তাঁর ঐ বালক বন্ধুর মধ্যে সত্যি সত্যি এক শক্তিশালী কবি অবস্থান করছেন। তাঁর আত্মপ্রকাশে তিনি কি কিছু করতে পারেন না? এই চিন্তা থেকেই দারোগা সাহেব স্থির করলেন যে, দুখু মিঞাকে রুটির দোকানের ঐ কষ্টসাধ্য চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁকে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবেন এবং তাঁদের বাড়িতে রেখে তাঁদের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন।

আসানসোলে রুটির দোকানে চাকরি করার সময়ে আর একটি এমন ঘটনা ঘটেছিল যা নজরুল-হৃদয়ের করুণা-কোমল ভালোবাসার দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সে সময়ে নজরুলের কর্মস্থল আসানসোলের ঐ রুটির দোকানের কাছেই খোঁড়া এক মৌনী ভিখারীর বাস ছিল। সে একটা টিনের মগ নিয়ে এদিক সেদিক ভিক্ষা করে বেড়াতো কিন্তু অধিকাংশ দিনই ভিক্ষায় তার তেমন কিছু জুটতো না। এতে খুবই দুঃখ হতো দুখু মিঞার। তিনি তাঁর নিজের খাবারের অনেকটাই ঐ মৌনী ফকিরকে-দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। এ ফকিরকে নজরুল খুবই ভালো-বেসে ফেলেছিলেন। ভালোবাসায় তাঁর অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। তাইতো হঠাৎ একদিন ঐ ফকিরের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে রাস্তার ধারে পড়ে-থাকা ঐ ভিখারীর শবদেহের কবরের ব্যবস্থা করেছিলেন। নজরুল এতটা আঘাত পেয়েছিলেন ঐ ফকির মিঞার মৃত্যুতে যে ঐদিনই রাত্রিবেলায় তিনি ঐ মৌনী ফকিরের ওপর এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করে ফেলেছিলেন। সেই পুরো কবিতাটি আজ আর পাওয়া যায় না। তবে 'কিশোর নজরুল' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত সে কবিতার অংশ বিশেষ থেকেই বুঝতে পারা যাবে কিরূপ কোমল-প্রাণ ছিলেন নজরুল। ঐ অতি করুণ কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন:

বুকের বেদনা বুকেতে রাখিলে ঢাকি
মরণের দিনে সেই বুকে হাত রাখি

দেখাইয়া গেলে ঐ স্থানে আছে লেখা—
ব্যাথার কাহিনী যাহা যায় নাকো দেখা।

* * * *

পাওনি দরদী বন্ধু জগৎ খুঁজি
দুঃখেতে তাই মুখটি রাখিতে বুজি
চাহনি ভিক্ষা কোন দিন কথা কয়ে
খোঁড়ায়ে খোঁড়ায়ে হেঁটে যেতে রয়ে রয়ে।
ঘুঙুর লাগান লাঠি এক হাতে ধরে
টিনের মগটি ঝুলিত কোমর 'পরে।

* * *

এই দোকানের সুমুখে পথের বাঁকে
তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত মাঝে ফাঁকে।
মোর গান শুনি থমকি দাঁড়াতে 'রাহে'
দোকানী কহিত—'হঠ্ যাও, হিয়া কাহে?'
মুখ ফিরাইয়া তুমি যেতে ধীরে সরে
আমার চক্ষু আঁসুতে উঠিত ভরে।
আমার কলিজা উঠিত মোচড় দিয়া...

* * *

তুমি জেনেছিলে মোরে আপনার জন
তাই তব লাগি কাঁদিতেছে মোর মন।

একজন সাধারণ ভিখারীর জন্যে এমনি হৃদয়ের কান্না নজরুলের মতো কবি-জনেই সম্ভব। প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত 'চড়ুই পাখীর ছানা' কবিতাটিতে যে পাঁচুর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে সে তো নজরুলেরই মর্মবেদনা।

এসব জেনেই কাজী রফিজুদ্দিন সাহেব হঠাৎ একদিন নজরুলকে নিয়ে তাঁর ময়মনসিংহ জেলায় নিজ বাড়িতে গিয়ে হাজির। বাড়ির সবাই ভারি খুশী এমন একটি সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল ছেলেকে পেয়ে। সময় নষ্ট না করে বাড়ির কাছেরই দরিরামপুর স্কুলে ছেলেটিকে ভর্তি করিয়ে

দিলেন দারোগা সাহেব। দুরন্তপনার সব রকম প্রমাণ দিলেও একটা বছর নজরুল ঐ স্কুলেই পড়লেন এবং বার্ষিক পরীক্ষাও দিলেন। কিন্তু একমাত্র বাংলা ছাড়া সব বিষয়েই যে ফেল! তবে বাংলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে একেবারে প্রথম এবং তাও আবার সব প্রশ্নের উত্তর কবিতায় লিখে। সবাই অবাক। কিন্তু তা হলে কি হবে, অন্য প্রতিটি বিষয়ে ফেল-করা ছাত্রকে তো আর প্রমোশন দেওয়া চলে না। এটা ১৯১৯ সালের কথা।

কী করা যাবে এখন? আবার গিয়ে লেটোর দলে যোগ দিলে কেমন হয়? বিষণ্ণ মনে এমনি ভাবতে ভাবতে ময়মনসিংহ থেকে নিজের গাঁয়ে চুরুলিয়ায় ফিরে এলেন নজরুল। ফিরে এসে লেটোর দলে আবার যোগ দিলে তাঁকে পেয়ে পুরানো বন্ধুদের সে কী আনন্দ! কিন্তু তাহলে কি হবে, বেশিদিন লেটোর দলের একঘেয়েমি চিরচঞ্চল নজরুলের ভালো লাগলো না। তিনি লেটোর গান গাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে আবার সেই পুরানো রানীগঞ্জের 'সিয়ারসোল রাজ স্কুলে' ভর্তি হয়ে গেলেন।

এবার খামখেয়ালী এই কিশোর কবির অস্থিরতা কিছুকালের জন্যে শান্ত হলো। তিনি একটানা তিন বছর পড়লেন এই স্কুলে। এ সময়ে তাঁর জীবনের বড়ো ঘটনা পাশের আরেকটা স্কুলের (রানীগঞ্জ হাইস্কুল) ছাত্র-কবি শৈলজানন্দর (বিখ্যাত লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। পরবর্তীকালে সেই বন্ধুত্ব প্রসঙ্গে শৈলজানন্দ লিখেছেন:

'নজরুল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর সবাই ডাকবে শৈলজা বলে, ও ডাকবে শৈল বলে। আমি রানীগঞ্জে, ও সিয়ারসোল রাজ স্কুলে। মাইল ছয়েকের ছাড়াছাড়ি। থার্ড ক্লাসে এসে মিললাম দু'জনে। আমি হিন্দু ও মুসলমান, আমি লিখি কবিতা—আশ্চর্য হচ্ছ—ও লেখে গল্প। তবু মিললাম দু'জনে। সেই টানে মিললাম, যে টানে ধর্মাধর্ম নেই, বর্ণাবর্ণ নেই, সৃষ্টির টান, সাহিত্যের টান। দুই জনে রোজ এক সঙ্গে মিলি, ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, কোনদিন বা স্কুল

পালাই। গ্রাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরি, ধরি ই আই আর-এর লাইন, কোন দিন বা চলে যাই শিশু-শালের অরণ্যে। তখন ইংরেজ-জার্মানিতে প্রথম লড়াই লেগেছে। আমরা দু'জন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠে প্রিটেস্ট দিচ্ছি। শহরে গাঁয়ে চলেছে তখন সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড়। হাতে গরম মুখে গরম বক্তৃতা। সবাই এগিয়ে গেল বীরত্বের ঘোড়-দৌড়ে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানই শুধু পিছিয়ে থাকবে?

'দুই বন্ধু ক্ষেপে উঠলাম। পরীক্ষা দিয়েই দু'জনে চুপি চুপি পালিয়ে এলাম আসানসোল। সেখান থেকে এস-ডি-ওর চিঠি নিয়ে সটান কলকাতা। আমি নামঞ্জুর হয়ে গেলাম।......নজরুলকে যুদ্ধে পাঠিয়ে 'সাথীহারা' হয়ে ফিরে এলাম গৃহকোণে।'

'কল্লোল যুগ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত শৈলজানন্দের এই বিবরণ থেকেই সৈনিক-কবি নজরুলের আবির্ভাবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সৈনিক কবি

স্কুল জীবন থেকেই দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নে পেয়ে বসেছিল নজরুলকে। শৈলজানন্দকে বন্ধু হিসাবে পাওয়ার পর স্বাধীনতার সেই নেশাটা তাঁর মধ্যে আরো তীব্র এবং আরো উগ্র হয়ে উঠেছিল। দুই বন্ধুতে মিলে সলা-পরামর্শ করে ঠিক করা হলো ইংরেজ শাসকদের এদেশ থেকে তাড়াতে হলে ভালো করে অস্ত্রশিক্ষা করাটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুযোগও এসে গেল খুব তাড়াতাড়ি। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ইয়োরোপে। দেখতে দেখতে তার ঢেউ এসে গেল আমাদের দেশেও। ইংরেজ সরকার তাদের ভারত সাম্রাজ্য থেকেও সৈন্য সংগ্রহ শুরু করলো। সেই সুযোগ নিতেই উঠে পড়ে লেগে গেলেন দুই বন্ধু। কলকাতায় এসে সৈন্য সংগ্রহ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে স্বাস্থ্যের কারণে বাতিল হয়ে গেলেন শৈলজানন্দ কিন্তু লম্বা-চওড়া সৈনিকোচিত চেহারা দেখে নজরুলকে যেন লুফেই নেওয়া হলো সৈন্যদলে।

বিফল মনোরথ শৈলজানন্দ বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন আর শত্রু-পক্ষের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তাদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রশিক্ষার জন্যে কাজী নজরুল মনের আনন্দে করাচী রওনা হয়ে গেলেন।

তখন আর তাঁর বয়েস কতো? মাত্র সতেরো। বাংলা ১৩২৩ অর্থাৎ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কথা। কী করে মার্চ করে সৈনিকরা এগিয়ে চলে, কী করে শত্রু নিধনে অস্ত্র চালনা করতে হয়—সে সব গভীর মনোনিবেশ সহকারে শিখতে থাকেন নজরুল করাচীতে গিয়ে। করাচীর গলজা লাইনের সৈনিক ব্যারাকে ছিল তাঁর বাস। সৈনিকদের সঙ্গে সর্বক্ষণ থেকে পুরোপুরি সৈনিক-শিক্ষা লাভ করে স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তা'হলেও সাহিত্য-সাধনায় বিরত হননি কখনো আজন্ম-কবি কাজী নজরুল। একদিকে চলেছে পড়া,

আরেক দিকে চলেছে রচনার পর রচনা—এ যেন গল্প, গান আর কবিতার ঝর্ণা।

রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ইত্যাদি কাব্যকথা অনেক আগেই পড়ে ফেলেছিলেন নজরুল। তা'ছাড়া গ্রীক, রোমান ও ইসলামী পৌরাণিক কাহিনীও তিনি অনেক পাঠ করেছিলেন। এক চাচা ও এক মৌলভীর কাছে আরবী-ফারসী মোটামুটি শিখে নেওয়ায় বাল্যকালেই আরবী-ফারসী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এবার করাচীর গলজা লাইনের বাঙালী পল্টনে এক পাঞ্জাবী মৌলভীর সাক্ষাৎ পেয়ে নজরুল ফারসী ভাষা পুরোপুরি শিখে নেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তাঁর অনূদিত 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থের মুখবন্ধেই সেই স্বীকৃতি রয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন :

'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরেজী ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলভী থাকতেন। এক দিন তিনি দিওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত ফার্সি কাব্যই পড়ে ফেলি।'

সে সময়েই নজরুল হাফিজের অনুবাদ করতে থাকেন এবং প্রায় একই সঙ্গে গান ও কবিতার পাশাপাশি তাঁর গল্প রচনাও চলতে থাকে। এ সবই তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয়।

সৈনিক জীবনের কঠোরতার মধ্যে থেকে নিয়মিত কাব্য চর্চা করে যাওয়া বা গল্প লেখা যে কী করে সম্ভব হয়েছিল তা ভাবাই যায় না। অজস্র চিঠিও নজরুল লিখেছেন করাচী সেনানিবাস থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। এক একখানি দীর্ঘ চিঠি। 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাসকে তার কাব্যিক ভাবালুতার জন্যে বোধহয় তাকে কাব্যোপন্যাসও বলা চলে। তার নায়ক-চরিত্র নুরুল হুদা নজরুল কবিমানসেরই প্রতীক-রূপ। করাচীর সেনানিবাস থেকে দোস্ত

রবিয়লের কাছে লেখা তেমনি একখানা চিঠি থেকেই জানা যায় কি রকম কঠোর পরিশ্রম তাঁকে করতে হতো সে সময়। ঐ চিঠির এক স্থানে রয়েছে ঃ

'আমি দিব্যি কিষ্কিন্ধ্যার নবাবের মত আরামে আছি। আজকাল খুব বেশী প্যারেড করতে হচ্ছে। দু'দিন পরেই আহুতি দিতে হবে কিনা! আমি পুণা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাশ করে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত শক্ত মাংস পেশীগুলো দেখাতে পারতাম! দেখছ, কি সুন্দর চটক্ কাজ? এখানে কথায় কথায় প্রত্যেক কাজে হাবিলদারজীরা হাঁক পারছেন, 'বিজলীকা মাফিক চটক হও'।—সাবাস জোয়ান্।

'এখন আসি। 'রোল কলের' অর্থাৎ কিনা হাজিরা দেবার সময় হল। হাজিরা দিয়ে এসে বেল্ট, ব্যাণ্ডোলিয়র্, বুট, পট্টি (এসব হচ্ছে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুরমত সাফ্-সুতরো ক'রে রাখতে হবে। কাল প্রাতে দশ মাইল 'রুট মার্চ' বা পায়ে হণ্টন।'

এরূপ দৈনন্দিন খাটাখাটুনির মধ্যেও কাজী নজরুল ছিলেন সদা প্রফুল্ল। লিখতেন, পড়তেন, গাইতেন—হৈ-হুল্লোড় করে আনন্দে দিন কাটিয়ে দিতেন। অবসর সময়ে মাঝে মাঝেই তাঁর মনে পড়ে যেতো স্কুলজীবনের সুন্দর দিনগুলির কথা। করাচী সেনানিবাস থেকে আর একজন বন্ধুর কাছে লেখা এক চিঠিতে নজরুলের ছাত্রজীবনের মধুর স্মৃতিকথা ভারি চমৎকার ফুটে উঠেছে। সেদিন 'প্রাতের আকাশটার শান্ত সজল চাউনি' নজরুলকে খুবই ব্যাকুল করে তুলেছিল। তার ওপর বিউগিলে যখন 'নো প্যারেড' বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো সেদিন আর প্যারেড হবে না তা শুনে যে আনন্দ তাঁর হয়েছিল তাকে কাজী বৃষ্টির দিনে স্কুল ছুটির আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন ঃ

'এমনি একটা আনন্দ-পাওয়ার আনন্দ পাওয়া যেত, যখন বৃষ্টি হওয়ার জন্য হঠাৎ আমাদের স্কুল বন্ধ হ'য়ে যেত। স্কুল প্রাঙ্গণে ছেলেদের উচ্চ হো-হো রোল, রাস্তায় জলের সঙ্গে মাতামাতি ক'রতে ক'রতে বোর্ডিং-এর দিকে সাংঘাতিক রকমের দৌড়, সেখানে গিয়ে

বোর্ডিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মুখের উপর এমন 'বাদল দিনে' ভুনী-খিঁচুরী ও কোর্মারা সারবত্তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে কোমর বেঁধে অকাট্য যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন; অনর্থক অনাবিল অট্টহাসি,—আহা, সে কি আনন্দের দিনই না চলে গেছে! জগতের কোন কিছুরই বিনিময়ে আমাদের সে মধুর হারানো দিনগুলি আর ফিরে আসবে না। ছাত্র-জীবনের মত মধুর জীবন আর নেই একথাটা বিশেষ করে বোঝা যায় তখন যখন ছাত্র-জীবন অতীত হয়ে যায়, আর তার মধুর ব্যথাভরা স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে ঝক্‌ঝক্ ক'রে ওঠে।'

নূরুলের (নজরুলের) এ চিঠিখানার মধ্যেই তাঁর বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার স্মৃতিকথা এসে পড়েছে। রবিয়লের সঙ্গে এই স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর বন্ধুত্ব হ'য়েছিল বলে এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু বাঁকুড়ায় কবি গিয়েছিলেন দু'টি অনুষ্ঠানে—গঙ্গাজলঘাঁটি জাতীয় বিদ্যালয় উদ্বোধনে ও পরে বাঁকুড়া শহরে যুব-ছাত্র সম্মেলনে। নজরুল কখনও পড়েছেন বাঁকুড়ায় এমন রেকর্ড কোথাও নেই যদিও ১৩৩২ সালে যুব ও ছাত্র সমাজের আমন্ত্রণে তিনি বাঁকুড়ায় যান। তবে এই বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুলের মতো যখন তখন নজরুলের মনে পড়ে যেতো তাঁর গ্রামের মক্তবের কথা, আসানসোলের সিয়ারসোল রাজ স্কুল ও মাথরুন বিদ্যালয়ের স্মৃতি। এমনকি সময় সময় ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর স্কুলে তাঁর সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার বিচিত্র ও আনন্দ-কোলাহল-মুখর জীবনটা কবি-সৈনিকের চোখের সামনে সময় সময় ভেসে উঠতো। কী উদ্দাম উচ্ছল সেই জীবন!

সবচেয়ে বেশি মনে পড়তো সিয়ারসোল রাজ স্কুল-জীবনের কথা। ঐ স্কুলেই নজরুল সবচেয়ে বেশিদিন পড়েছিলেন কিনা তাই। ঐ সময়ে রচিত তাঁর এক একটি গান ও কবিতায় তাঁর মন ভরে উঠতো। ব্যারাকে বসেই তিনি বাল্যকালের তাঁর সেই সব রচনা যখনই ইচ্ছে হতো আবৃত্তি করতেন। অদ্ভুত ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি! সিয়ারসোল রাজ স্কুলে পড়ার সময় তিনি অনেকগুলি কবিতা লেখেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রাজার গড়' ও 'রানীর গড়' এবং 'চড়ুই পাখির ছানা'।

জন্মগ্রামের কথা মনে পড়লেই নজরুলের ইচ্ছে হতো সিয়ারসোলে বসে লেখা 'রাজার গড়' ও 'রানীর গড়' কবিতা দু'টি আবৃত্তি করতে। কখনো একা একা আবার কখনো বা ডানপিটে বন্ধু মণিভূষণ মুখো-পাধ্যায় প্রভৃতির আড্ডায় বসে গল্পে গল্পে একেবারে স্কুলজীবনে ফিরে গিয়ে তিনি 'রাজার গড়' আবৃত্তি শুরু করতেন :

ঐ—গাঁয়ের দখিণে দাঁড়ায়ে কে তুমি
যুগ যুগ ধরি একা গো।
তোমার বুকে কিসের মলিন রেখা গো ?
এ কোন্ দেশের ভগ্নাবশেষ
কোন্ দিদিমার কাহিনীর এ দেশ ?
দূর অতীতের আবহায়াটুকু রেখেছ পাষাণে ঢাকা গো।
কোন্ চিতোরের চিতার ভস্ম তোমার উরসে মাখা গো।

ওগো কে তুমি আমার পল্লী-মায়ের দুখের কাহিনী কহিছ ?
নীরব নিঝুম গভীর ব্যথাটি গাহিছ ?
মা নাকি ছিল রাজার দুলালী
আজ অনাথিনী পথের কাঙালী
মরমের ব্যথা মরমে চাপিয়া ঝাঁও হ'য়ে পুড়ে গাহিছে—
নীরব কবির নীরব ভাষায় পেলব গাথাটি গাহিছ।
কভু তোমার বক্ষ জুড়িয়া শোভিত
নরত্তম রাজ-কেয়ারী,
মাঝে নাকি ছিল প্রাসাদ হাজার দুয়ারী।
আঁকড়ের ঝোপ এখন সেথায়
ঘিরিছে বোয়ান অলক'লতায়
সকাল-সাঁঝে খেলত যেথায় সুগন্ধ ফুল কেয়ারী
হাতে হাত ধরে আসত সেথায়—আসত রাজার ঝিয়ারী।

ঐ—তোমার শিয়রে এখনও জাগিয়া
বিশাল শিমুল গাছটি
ওগো সব গেছে, সে শুধু ছাড়েনি কাছটি।
এখনও নিশীথে কে তার শাখায়
আকুল কাঁদনে গ্রামটি কাঁপায়,
স্বপনের ঘোরে আঁত্‌কে ওঠে গো মায়ের কোলে বাছাটি।
কেউ জানে না যে কত যুগ ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে গাছটি।

'রাজার গড়' কবিতাটির মধ্যে বালক কবির অপটু হাতের কিছুটা ছাপ থাকলেও তাতে গ্রাম-জননীর প্রতি কবির যে একটা আন্তরিক আকুতি ও দরদ ফুটে উঠেছে পরবর্তীকালে তাই অজস্র কাব্যে-গানে তীব্র দেশ-প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশ-জননীর উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ্য হিসাবে। জন্ম-গ্রামের পটভূমিকায় রচিত 'রানীর গড়' কবিতাটি দীর্ঘতর এবং ছন্দে মধুরতর। বিশেষ করে ছন্দের সেই ধ্বনিটি পাঠকদের উপভোগের জন্যে এখানে তার সামান্য কিছু অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হলো :

ওই—ঝাউএর পাহাড়ে নীরব চিতাটি রানীমা'র!
ও যে—দপ্‌ দপ্‌ জ্বলে, লোকে বলে আলো আলেয়ার।
এই নিবে যায় এই জ্বলে ওঠে
থমকি চমকি পিছু দিকে ছোটে,
মিশে যায় শেষে রাজ-গড়ে উঠে
আবার তেমনি আঁধিয়ার!
ওই শোনা যায় দু'পহর রাতে
ঝটিকার মুখে হাহাকার।
ওগো রানীমা'র—আহা রানীমা'র!
ওই—ঝাউএর পাহাড়ে নীরব চিতাটি রানীমা'র!

এখানেও পল্লী মায়ের প্রতি কবির সেই মর্মস্পর্শী আকুতি পাঠকের মনে একটা দোলা লাগায়। প্রায় একই সময়ে (সিয়ারসোল স্কুলে পড়ার কালে) রচিত নজরুলের 'চড়ুই পাখীর ছানা' কবিতাটি প্রথম

অধ্যায়েই উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটি কবির খুবই প্রিয় কবিতা বাল্য-রচনাবলীর মধ্যে এবং এর একটা সুন্দর ইতিহাসও আছে। সিয়ার-সোল রাজ স্কুলে পড়ার সময় নজরুল যে মুসলিম ছাত্রাবাসে থাকতেন তার কড়িকাঠ থেকে একটি চড়ুই পাখীর উড়তে-না-জানা বাচ্চাকে পড়ে যেতে দেখে মনে খুবই একদিন ব্যথা পেয়েছিলেন কবি। সেখানে তখন শৈলজানন্দ এবং আরো অন্য কয়েকজন বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন এবং নজরুলের মতো ব্যথাতুর হয়ে শৈলজানন্দও সেই ঘটনাকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করে ফেলেছিলেন।

কিন্তু এসব বাল্য-রচনায় স্মৃতিচারণাতেই যে ব্যারাক-জীবনের সব অবসর সময়টুক কাজী কাটিয়ে দিতেন তা' নয়। তাঁর 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের আটটি গল্পই করাচী সেনানিবাসে বসেই লেখা। 'ব্যথার দান' গল্প সংকলনের গল্প ছয়টি আরো আগের রচিত। রাইফেল ও কলমের মার্চ একই সঙ্গে চলেছে আমাদের সৈনিক কবির। করাচীর গলজা লাইনে বাঙালী পল্টনের পাঞ্জাবী মৌলভী পণ্ডিতের কাছে ফারসী ভাষাটা খুব ভালো করে শিখে নিয়ে পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি হাফিজের রুবাই অনুবাদ করে চলেছিলেন দিনের পর দিন। তারই একটি 'আশায়' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মাসিক সাহিত্য-পত্র 'প্রবাসী'র ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী'তে কিছু ছাপা হ'লে তাকে লেখকের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি বলে গণ্য করা হতো। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে নজরুল সে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এবং কিছুদিন পূর্বে সৈন্য বিভাগে হাবিলদার পদে উন্নীত হওয়ায় সে সময়ে তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' কথাটি যুক্ত থাকতো। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'আশায়' শীর্ষক অনুবাদ কবিতাটির নিচেও (হাবিলদার) কাজী নজরুল ইসলাম নামই দেখা যায়। কিছুকাল আগে থেকে বনেদী সাহিত্য-পত্র 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হচ্ছে বীরবলের (প্রমথ চৌধুরী) সম্পাদনায়। ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কবি ঐ কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। 'সবুজপত্র'-এ না পারলেও তাঁরই চেষ্টায় 'প্রবাসী'তে

ঐ কবিতাটি প্রকাশিত হয় এবং সেই থেকেই তাঁদের দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে আজীবন বন্ধুত্ব।

করাচীতে তিন বছরের সৈনিক জীবনে কাজী-কবি যে সমস্ত কবিতা ও গান রচনা করতেন বা হাফিজের অনুবাদ করতেন সেগুলো মাঝে মাঝে কলকাতার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দিতেন কিন্তু বড়ো একটা প্রকাশিত হতো না। তাই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মশাইয়ের চেষ্টায় নজরুলকৃত হাফিজের ছ'লাইনের ছোট্ট 'আশায়' শীর্ষক কবিতাটি 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় কিশোর-কবি খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন।

সৈনিক জীবনের তিন বছরে নজরুল রচিত কথাসাহিত্যের একখানি উপন্যাস 'বাধনহারা' এবং একটি গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'তে আত্মকথার কিছু কিছু ছায়াপাত ঘটেছে বলেই এ রচনা দু'টির গুরুত্ব রয়েছে বটে তবে উপন্যাস বা গল্প হিসাবে নজরুলের কোনো রচনাকে সার্থক বলা চলে না। 'বাধনহারা' একটি পত্রোপন্যাস। তার নায়ক নুরুল হুদা যে নজরুলেরই ছদ্মনাম তা করাচী সেনানিবাস থেকে নুরুল হুদার চিঠিগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায়। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' 'রিক্তের বেদন' গল্প সংকলনের একটি কাহিনী। বাঙালী পল্টনের এ বাউণ্ডেলে যুবকটি গল্পের খাতিরে বাগদাদে গিয়ে মারা পড়লেও স্মৃতিচারণায় যে আত্ম বর্ণনা সে দিয়েছে তাতে নজরুল জীবনের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে। নজরুলের এমনি আরো কিছু কিছু গল্পে তাঁর আত্মজীবনীর আংশিক রূপায়ন ধরা পড়ে।

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্পটি 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের অপর সাতটি গল্পের মতোই করাচীতে থাকার সময়েই 'আরবসাগরের বিজন বেলায়' বসে লেখা। গল্পটি ১৩২৬ সালের 'সওগাত' মাসিক-পত্রের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। মাত্র ছয় মাস আগে ১৩২৫ সালের অঘ্রাণ মাসে সেকালের অন্যতম সেরা বাংলা সাহিত্য-পত্র 'সওগাতে'র প্রকাশ শুরু হয়েছিল। সৈনিক জীবন শেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে গিয়েছিলেন।

করাচী থেকে প্রেরিত সৈনিক-কবির হাসির কবিতা 'সমাধি'ও তাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

'সওগাতে' নজরুলের লেখা প্রকাশিত হবার আগেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ত্রৈমাসিক সাহিত্য-মুখপত্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ (পরে ডক্টর) ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় রচনাদি পাঠাতে থাকেন আমাদের সৈনিক কবি। মুসলমান সাহিত্য সমিতির সর্বসময়ের কর্মী শ্রমিক-নেতা মুজফ্ফর আহ্মদের হাতে নজরুলের লেখা পড়তেই তিনি তাঁর শক্তিমত্তায় আকৃষ্ট হন এবং চিঠিপত্র লেখালেখির ফলে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়। এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে মুজফ্ফর আহ্মেদ সাহেবের আত্মকথায়। স্মৃতিচারণায় আহ্মেদ সাহেব লিখেছেন :

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় ছাপানোর জন্যে নজরুল যখন প্রথম লেখা পাঠিয়েছিল (১৯১৮) তখন হতেই তার সঙ্গে আমার পত্র লেখালেখি শুরু হয়। আমি তার 'ব্যথার দান' গল্পটির একটি শব্দের পরিবর্তন করেছিলাম। এই সূত্রে তার সঙ্গে আমার চিঠিপত্রের পরিচয় চিঠিপত্রের বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমার পরিবর্তন নজরুলের খুব পছন্দ হয়েছিল।...

" 'ব্যথার দান' একটি ভালবাসার গল্প। এই গল্পের ভিতর দিয়েই ব্রিটিশের একজন ভারতীয় সৈনিক, বিশ বছরের যুবক নজরুল ইসলাম যে রুশবিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।"

আহ্মেদ সাহেব তাঁর স্মৃতিকথায় 'ব্যথার দান' গল্পটিতে তিনি যে পরিবর্তন করেছিলেন সে বিষয়ে লিখেছেন, "গল্পটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকায়' ছাপানোর সময়ে আমি 'লালফৌজ' কথাটা গল্প হতে কেটে দিয়ে তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' কথা বসিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের দেশের পুলিশ তখন ভারতীয়দের (গল্প হলেও) লালফৌজে যোগ দেওয়া কিছুতেই হজম করতে পারতো না।

...আমি যে লালফৌজ কথাটি কেটে দিয়েছিলাম তার জন্যে খুশী হয়ে নজরুল আমায় ধন্যবাদ জানিয়েছিল।"

এ প্রসঙ্গেই স্মৃতিকথায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ সাহেব নজরুল সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথা বলেছেন তা হলো এই, 'আমার যতটা জানা আছে নজরুলের আগে বাঙলাদেশের, সম্ভবত ভারতবর্ষেরও, কোনও কবি ও সাহিত্যিক রুশ বিপ্লবের পরের সোবিয়েৎ ভূমির কথা তাঁদের লেখায় উল্লেখ করেন নি। এমন আন্তর্জাতিকতার পরিচয়ও বিপ্লবের এক বছরের ভিতরে অন্য কোন কবি ও সাহিত্যিক দেন নি। নজরুলের কবিতার ভিতর দিয়ে যে সাম্যবাদী সুর ফুটে উঠেছে তার সূত্রপাত নিশ্চয় করাচীর সেনা-নিবাসে হয়েছিল।'

নজরুলকে ভারতের প্রথম সাম্যবাদী কবি বলে উল্লেখ করেছেন ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ। একি কম বড়ো কথা!

'ব্যথার দান' গল্পটি করাচী সেনা-নিবাসে ১৩২৫ সালে (১৯১৮) রচিত এবং 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রেরিত হলেও গল্পটি ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ১৩২৬ সালের (১৯২০) মাঘ সংখ্যায়। ঐ বছরেরই শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় 'মুক্তি' শীর্ষক একটি কবিতা ছাপা হয় যেটি নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কবিতা। নজরুল এই কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন 'ক্ষমা'। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ সাহেবই মূল নামটি পাল্টে দিয়ে কবিতাটির নতুন নামকরণ করেছিলেন 'মুক্তি'। এই নাম পরিবর্তনেও কবি যে খুশী হয়েছিলেন তা' তিনি করাচী ক্যান্টনমেন্ট থেকে লেখা তাঁর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগস্টের চিঠিতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ সাহেবকে জানিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন যে, এরূপ উৎসাহ পেলে তিনিও যে এক 'মস্ত জবর কবি ও লেখক' হয়ে উঠবেন তা' হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেবেন। সে প্রমাণ তিনি যে সত্যি সত্যি দিয়েছিলেন তা আমরা সবাই জানি।

নানা দিক থেকেই সৈনিক কবির এই চিঠিখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বলে পূরো চিঠিখানাই এখানে প্রকাশ করা হলো। চিঠিতে লেখা হয়েছে :

আদাব হাজার হাজার জানবেন !

বাদ আরজ আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশী। আমার সব চেয়ে ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারী লেখা 'কোরকে'র কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি কোরক ব্যতীত প্রস্ফুটিত ফুল নই ; আর যদিই সেরকম হ'য়ে থাকি কারুর চক্ষে তবে সে বেমালুম ধুতরো ফুল। যা হোক আমি তার জন্য আপনার নিকট যে কত বেশী কৃতজ্ঞ তা' প্রকাশ করার ভাষা পাচ্ছিনে। আপনার এরূপ উৎসাহ থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব তা' হাতে-কলমে প্রমাণ ক'রে দেব, এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্য কথা। কারণ এবারে পাঠালুম একটি লম্বা-চওড়া 'গাথা' আর একটি 'প্রায় দীর্ঘ গল্প' আপনাদের পরবর্তী সংখ্যার কাগজে ছাপবার জন্য, যদিও কার্তিক মাস এখনো অনেক দূরে। আগে থেকে পাঠালুম, কেন না এখন হ'তে এটা ভাল ক'রে পড়ে রাখবেন এবং চাই কি আগে হ'তে ছাপিয়েও রাখতে পারেন। তা' ছাড়া আর একটি কথা। শেষে হয়ত ভাল ভাল লেখা জমে আমার লেখাকে বিলকুল রদ্দি করে দেবে ; আর তখন হয়ত এত বেশী লেখা না পড়তেও পারে। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, সম্পাদক বেচারাদের গলদঘর্ম হ'য়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যিক রোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্মিতে। যাক, অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামকা টুটি চেপে রেখেছিলুম। এখন বাকী কথা ক'টি মেহেরবানী ক'রে শুনুন। যদি কোন লেখা পছন্দ না হয়, তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরীবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনের পাথেয় পাঠিয়ে দেব। কারণ, সৈনিকের বড় কষ্টের জীবন। আমি তার চেয়ে হাজারগুণ পরিশ্রম করে একটু-আধটু লিখি। আর কারুর কাছে ও একেবারে worthless হ'লেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক। আর

ওটা বোধহয় সকল লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পছন্দ হল কিনা, জানবার জন্য আমার নাম ঠিকানা লেখা Stamped খাম দেওয়া গেল এর সঙ্গে। পড়ে মত জানাবেন।

আর যদি এত বেশী লেখা ছাপাবার জায়গা না থাকে আপনার কাগজে, তা'হলে যে কোন একটা লেখা 'সওগাতে'র সম্পাদককে Handover করলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু' একটা করে। যা ভাল বুঝবেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাসা বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দেব, কারণ এখনও অনেক সময় রয়েছে।

আমাদের এখানে সময়ের money value ; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গ সুন্দর হতেই পারে না। Undisturbed time মোটেই পাইনা। আমি কোন কিছুরই Copy of duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by, আপনারা যে 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির মুক্তি নাম দিয়েছেন, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন করে নেবেন। বড্ড ছাপার ভুল থাকে, একটু সাবধান হওয়া যায় না কি ? আমি ভাল, আপনাদের কুশল সংবাদ দেবেন।

নিবেদন ইতি—

খাদেম,

—নজরুল ইসলাম

এখানেই দেখা যাচ্ছে নজরুল ইসলাম তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'ক্ষমা', কিন্তু তার নাম পাল্টে দিয়ে নতুন নামকরণ করা হয়েছিল 'মুক্তি'। নজরুলের এই প্রথম প্রকাশিত কবিতাটির কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

রাণীগঞ্জের অর্জ্জুন পটির বাঁকে,
সেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে

রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে-বৌ
কলস কাঁখে।
সেই সে বাঁকের শেষে,
তিন দিক হতে তিনটা রাস্তা এসে
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মত গেছে একেই মিশে।
তে-পথার সেই দেখাশুনার স্থলে—
বিরাট একটি নিমগাছের তলে,
জটওয়ালা সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধতো সেথা ;
গাঁজার ধূয়ায় পথের লোকের আঁতে হতো বেথা—

এ ভাবেই নজরুল ইসলাম তাঁর সৈনিক জীবনের তিনটি বছর কঠোর সামরিক শৃঙ্খলার মধ্যেও গল্প-উপন্যাস লিখে, ছড়া-কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে এবং গানের পর গান লিখে ও গান গেয়ে এবং বিদেশী কবিতা অনুবাদ করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি তিনি লাভ করতে পারেন নি। তার কারণ, যে লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি সামরিক শিক্ষা লাভের জন্যে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে কলকাতা থেকে করাচীতে চলে এসেছেন পুরোপুরি সে বিদ্যা অর্জনের সুযোগ সৈন্যদলে ঢুকেও পাওয়া সম্ভব নয়। ইংরেজের সৈনিক বিভাগটাও একটা বড়ো গোলামখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখানেও গোরা সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে যে শ্রেণীপার্থক্য তা তাঁকে ক্রমশই বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। যে বেড়ি ভাঙার ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁর সামরিক বাহিনীতে আসা সেখানেও যে বেড়ির পর বেড়ি! অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন কবি। আর সহ্য করতে না পেরে তিনি ছুটির দরখাস্ত করে বসেছিলেন সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এবং সে আবেদন মঞ্জুর হলে তিনি সোজা তাঁর গ্রাম-জননী চুরুলিয়ার কোলে যেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কি একটা গোলমালে পড়ে স্বগ্রামে এমনি বিরক্ত হয়ে যেতে হয়েছিল নজরুলকে যে সাত-আটদিন পরেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসের ঠিকানা—৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট—তাঁর জানাই ছিল। নজরুল

সরাসরি সেই ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে তাঁর পরম হিতৈষী মুজফ্ফর আহ্মেদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে এটিই প্রথম সাক্ষাৎ।

নজরুল জানতেন, মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিছুকালের মধ্যেই তাঁদের পাকাপাকি ভাবে ছুটি হয়ে যাবে। তবু ক্ষ্যাপা কবি অস্থির হয়ে বাড়িতে ছুটি নিয়ে চলে এসেছিলেন ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে। বাড়ি থেকে কলকাতায় আসার পথে বর্ধমানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর কাছে একটা ছুটির দরখাস্ত পেশা করে এসেছিলেন। সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়া হলে তাঁর খরচ চলবে কি করে, সে চিন্তা তখনই তাঁর মাথায় ঢুকেছিল। এসব কথাই তিনি বলেছিলেন মুজফ্ফর সাহেবকে এবং মুজফ্ফর সাহেবও তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে কবি যেন কলকাতায় তাঁদের সাহিত্য সমিতির আফিসেই এসে ওঠেন। সে পরামর্শ মতোই কাজ করেছিলেন সৈনিক কবি। কয়েক মাস বাদে ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে করাচী সেনানিবাস তুলে দেওয়া হলে নজরুল কলকাতায় ফিরেই সরাসরি তাঁর তল্পিতল্পা নিয়ে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির কার্যালয়েই এসে উঠেছিলেন।

সংসারের দারিদ্র্যের কথা মনকে সব সময় উদ্‌ভ্রান্ত করে রাখলেও সমগ্র দেশের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির চিন্তায়ও খেয়ালী সৈনিক কবি নজরুল হয়ে উঠেছিলেন উন্মাদ। তাইতো তিনি অগ্রপথিক তরুণ সমাজকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন :

অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর কদম চলরে চল্!
রৌদ্র দগ্ধ মাটি মাখা শোন্ ভাইরা মোর
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর!

এই নব অভিযানের নায়ক নজরুলের কাছে সত্যি সত্যি একদিন একটা সরকারি চাকরির সাব-রেজিস্ট্রারের পদ-গ্রহণের আহ্বান-পত্র এসে হাজির হয়েছিল। সে চাকরি গ্রহণ করলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই হয়তো জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু 'অগ্র-

পথিক' কবিতায় তিনি তো স্পষ্ট করেই লিখে দিয়েছেন, 'আমরা চাহিনা তরল স্বপন, হালকা সুখ'। কারণ :

অভিযান-সেনা আমরা ছুটি দলে দলে
বনে নদীতটে গিরিসঙ্কটে জলে থলে।
লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমেষে,
জয় করি সব তস্‌নস্ করি পায়ে পিষে,
অসীম সাহসে ভাঙি আগল্!
না-জানা পথের নকীব দল,
জোর্ কদম্ চলরে চল ॥

দাসত্বের আগল ভাঙবার জন্যে মন যার ব্যাকুল তিনি কি আর সামান্য সুখের জন্যে বিদেশী প্রভুর গোলামী করতে সহজে রাজী হতে পারেন? পরামর্শ চাইলেন তিনি মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ সাহেবের যিনি পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, পরাধীন দেশের সরকারের চাকরি করবে তুমি?

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই চাকরির চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন কবি। তাঁর আর বর্ধমানে সাব-রেজেস্ট্রারের কাজ করা হলো না। সৈন্যদলে তিন বছরের চাকরিই নজরুলের জীবনের প্রথম ও শেষ সরকারি চাকরি। তারপরই তিনি পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে।

বিদ্রোহী কবি

কবি নজরুল ইসলামের জীবনে ১৯২১ ও ১৯২২ সাল ছ'টি সর্বাধিক স্মরণীয় ছ'টি বছর। এবং কবির কারাবাসের বছর হিসাবে পরের বছরটিও। জাতির মহা জাগরণের দিক থেকেও এ সময়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়েই সাম্যবাদী নায়ক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের অভিভাবকতায় ও আশ্রয়ে থেকে ১৯২১ (বাংলা ১৩২৮) সালের দুর্গোৎসবের কিছু আগে 'বিদ্রোহী' নামে এমন একটি কবিতা বচনা করলেন যেটি 'মোসলেম ভারত' সাহিত্য পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাঙলার জনমানসে যেন একটা ভূমিকম্পের সৃষ্টি হলো। এই একটি মাত্র কবিতার চাহিদায় কয়েকদিনের মধ্যে 'মোসলেম ভাবত' কার্তিক সংখ্যা নিঃশেষিত হলে সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় এবং 'প্রবাসী'তেও কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হলো এবং মুখে মুখে কবিতাটির আবৃত্তি শোনা যেতে লাগলো কোথাও অংশত কোথাও বা সম্পূর্ণ। সেই থেকেই 'বিদ্রোহী কবি' নামে সর্বত্র পরিচিত এবং প্রচারিত হতে থাকলেন নজরুল।

ইংরেজের গোলাম হিন্দু-মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্যে সমগ্র জাতিকে ডাক দিয়ে কবি বললেন :

বল বীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

এর আগে আর কোনো কবি বা কোনো নেতা এমন নির্ভয় আহ্বান দেননি জাতিকে। তাই এই ডাক শুনে সমগ্র জাতি সেদিন হকচকিয়ে উঠেছিল গা-ঝাড়া দিয়ে। কবির কঠোর প্রতিজ্ঞায়—পৃথিবীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করবার ঘোষণায় দুর্বার সাহসে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ যখন তাঁর বিদ্রোহী লেখনী থেকে নিসৃত হচ্ছিলো :

আমি হল বলরাম স্কন্ধে
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে—
নবসৃষ্টির মহানন্দে।

যতদিন না সেই লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে ততদিন কোনো যুদ্ধ-বিরতি নেই, লড়াই চলতেই থাকবে। বিদ্রোহী কবি তাইতো লিখলেন :

মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত!

বিদ্রোহী কবি নজরুল ছাড়া আর কার পক্ষে বলা সম্ভব—

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

'মোসলেম ভারত' পত্রিকার এই কার্তিক সংখ্যাতেই 'কামাল পাশা' নামে নজরুলের আরেকটি চমৎকার কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে কবি নবীন তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা প্রগতিশীল সুলতান কামাল পাশাকে অভিনন্দিত করে লিখেছেন :

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে
কামাল ভাই।
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল
সামাল ভাই।

তখনকার দিনে তরুণদের মুখে মুখে এ কবিতাটিও শোনা যেতো বটে, তবে 'বিদ্রোহী' কবিতার পর বিদ্রোহের সুরারোপিত আরো যে কয়টি কবিতা সে সময়ে দেশবাসীর মনে বিদ্রোহের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে তার মধ্যে 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' এবং

'ধূমকেতু' নামক কবিতা দুটির উল্লেখ করতেই হয়। তা ছাড়া 'সর্বহারা' কাব্য-সংকলনের কবিতাবলীও বিদ্রোহাত্মক মানসিকতার প্রশ্রয়পুষ্ট। 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' কবিতাটির শুরুই হয়েছে বিদ্রোহের বাণী নিয়ে :

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখেব উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে—
বান ডেকে এ জাগ্‌ল জোয়াব দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে
এ রক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

এই কবিতাবই শেষাংশে বিপ্লবেরই নৃত্য-ছন্দে বলা হয়েছে :

আজ জাগ্‌ল সাগব, হাস্‌ল মরু,
কাঁপল ভূধব, কানন তরু,
বিশ্ব-ডুবান আস্‌ল তুফান উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জড়ায় মরা বাম পাশে।
মন ছুট্‌ছে গো আজ বল্গা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে,
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে॥

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন তখন জোর চলছিল সারা দেশ জুড়ে। মহাত্মাকে নিয়ে গদ্য-পদ্য অনেক রচনাই নজরুল লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী নজরুলের আত্মপ্রকাশই ঘটেছিল ১৯২১ সালের গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ ও বিদেশী বর্জন আন্দোলনের সময়ে। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের কুখ্যাত জেনারেল ও'ডায়ারের

ভয়াবহ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর সারাদেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নারকীয় ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজ শাসকদের দেওয়া নাইটহুড উপাধি ঘৃণাভরে ফেরৎ দিলেন এবং তারপরেই আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-বিজয়ী মহাত্মা গান্ধী এসে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সারথ্য ও সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন।

একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রায় একই সঙ্গে নজরুল তাঁর বিদ্রোহের পতাকা হাতে নিয়ে এক দিকে সহিংস বিপ্লব ও অন্যদিকে গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবের সমর্থনে একের এক রচনা তৈরি করে চলেছেন। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে কবিতা বা গান রচনায় তাঁর কালে তাঁর কোনো জুড়ি ছিলই না বলা চলে।

সে কথা থাক। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯২১ ও ১৯২২ এবং বন্দিত্ব বরণের জন্যে ১৯২৩ সালও নজরুল জীবনের সর্বাধিক স্মরণীয় বছর। সংক্ষেপে ১৯২১-এর কথা আলোচিত হয়েছে। ১৯২২ সালে গুরুত্ব বিশেষ করে দু'টি কারণে। প্রথমত, এ বছরেই বিদ্রোহী কবির প্রথম কাব্য সংকলন 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় যে গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পট এঁকে দিয়েছিলেন স্বয়ং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। কবি সে গ্রন্থ অগ্নিমন্ত্রের প্রধান ঋত্বিক অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী নায়ক শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। সেই উৎসর্গ-পত্রে নজরুল লিখেছিলেন :

> অগ্নি ঋষি অগ্নিবীণা তোমায় শুধু সাজে
> তাইতো তোমার বহ্নিরাগেও বেদন বেহাগ বাজে।

নজরুলের এই প্রথম কাব্য সংকলনেরই প্রথম কবিতা 'বিদ্রোহী,' বহুল প্রচারিত যে কবিতাটি নিয়ে কয়েক বছর ধরে যার পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। এ সব আলোচনা-সমালোচনার জবাবে কবি করটিয়া কলেজের অধ্যক্ষ খান সাহেব ইব্রাহিমের কাছে লেখা একখানি দীর্ঘ চিঠির একস্থানে লিখেছেন :

'বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান

গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা—সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি—এই ত আমার অপরাধ। এরই জন্য ত আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধিনিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি এর দরকার ছিল মনে করেই।

'...এই কুম্ভকর্ণ মার্কা সমাজকে জাগাতে হ'লে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে।'

বয়োজ্যেষ্ঠ হিতৈষী বন্ধু কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' (বছর ছয় আগে 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত) কথিকাটি অবলম্বনে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা রচিত হয়েছিল, মোহিতলালের এই দাবী নিয়ে দুই বন্ধুতে বিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে এ বিষয়ে নজরুল কাব্যের একান্ত অনুরক্ত সুপণ্ডিত কাজী অব্দুল ওদুদের বক্তব্যটি খুব পরিষ্কার। তিনি তাঁর 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে বলেছেন :

'কবির প্রায় ২৩ বৎসরের বিপুল সাহিত্য সাধনার উপরে চোখ বুলিয়ে আমার মনে হয়েছে, 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকৃতই কোন বিদ্রোহ-বাণীর বাহক নয়, এর মর্মকথা হচ্ছে এক অপূর্ব উন্মাদনা—এক অভূতপূর্ব আত্মবোধ—সেই আত্মবোধের প্রচণ্ডতায় ও ব্যাপকতায় কবি উচ্চকিত —প্রায় দিশেহারা। এর মনে যে ভাব সেটি এক সুপ্রাচীন তত্ত্ব, ভারতীয় 'সোঽহম্' 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' : 'যত্র জীব তত্র শিব' বাণীতে তা ব্যক্ত হয়েছে, সুফীর 'আনালহক' বাণীতেও সে-তত্ত্ব রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগরূপ মহাবিদ্রোহও হয়তো এর মূলে রস যুগিয়ে-ছিল। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের মতে শ্রীঅরবিন্দের কলকাতার শিষ্যদের সাহচর্যে কবির 'সোহম্' তত্ত্বে দৃঢ়স্থিতি ঘটে।'

এই 'সোহম্' ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই কবি লিখতে পেরেছেন :

বল বীর
আমি চির-উন্নত শির !
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত নৃশংস
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত-বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !
ইত্যাদি

'আমিই সে' যে সব কিছুই করতে পারে এইতো 'সোহম্' মন্ত্রের মূল শিক্ষা।

যাই হোক, এই 'বিদ্রোহী' কবিতার পর থেকেই বিপ্লববাদের সমর্থনে একের পর এক কবিতা রচনায় বিদ্রোহাত্মক কবিতার যেন জোয়ার বইয়ে দিয়ে চললেন নজরুল। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় তিনি লিখলেন :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!
ঐ নূতনের কেতন ওরে
কাল বোশেখির ঝড়।
... ...
আসছে এবার অনাগতের প্রলয় নেশার নৃত্যপাগল,
সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাংল আগল,
মৃত্যুগহন অন্ধ কূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে
ধূম্র ধূপে
বজ্র শিখায় মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !

মহাকাল তাঁর বজ্রশিখার মশাল জ্বালিয়ে ভয়ঙ্করের রূপ ধ'রে আসছেন। তাঁকে ভারতীয় মুক্তি-যজ্ঞের হোতা রূপে জয়ধ্বনিসহ বরণ করে নেবার জন্যে দেশবাসীর উদ্দেশে এই ভাবে আবেদন জানালেন বিদ্রোহী কবি।

কিন্তু জাতীয় মুক্তি অর্জনে বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রেরণা যোগানোর জন্যে বিপ্লবীদের মুখপত্র রূপে নজরুল একখানি সাময়িকপত্র প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর পরম হিতাকাঙ্খী বিপ্লবী নায়ক হুগলীর শ্রীভূপতি মজুমদার প্রভৃতির আন্তরিক সমর্থন লাভ করলেন এবং তাতে তাঁকে উৎসাহিত করলেন তাঁর সব কবি-সাহিত্যিক বন্ধুরা। পত্রিকার নাম ঠিক হলো 'ধূমকেতু', রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে যার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাঙলা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। প্রথম পাতার মাথায় একটা জ্বলন্ত ধূমকেতুর ছবি নিয়ে এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধের ওপরে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীসহ প্রকাশিত 'ধূমকেতু' পড়তে সে সময়ে যে কী রকম টানাটানি পড়ে যেতো তখনকার পাঠকদেব সকলেরই তা মনে থাকার কথা। সপ্তাহে দু'বার করে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল 'ধূমকেতু'র। সে সময়ে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' দলের বহু বিপ্লবী নজরুলের চার পাশে এসে জড়ো হয়েছিলেন।

অহিংস বিপ্লবের সমর্থক হয়েও এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করলেও দেশের স্বাধীনতার জন্যে এমনি উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম যে ঘরে বসে তাঁত বুনে এবং চরকা ঘুরিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনা যাবে, এ বিশ্বাস তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন এক বছরের মধ্যেই এবং স্বাধীনতা আনতে হবে রক্তের মূল্য দিয়ে, এই ধ্রুব ধারণা থেকেই তিনি গেয়েছিলেন:

সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই
বসে বসে কাল গুণি।
জাগরে যোয়ান বাত ধরে গেল,
মিথ্যার তাঁত-বুনি!

তার পরেই ১৯২২ সালের (বাংলা ১৩২৯) ১১ আগস্ট কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রথমে ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট পরে ৭ নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেন, কলকাতা থেকে 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হতে থাকলো যার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক প্রথম দিনেই 'ধূমকেতু' শীর্ষক কবিতায় লিখলেন :

আমি যুগে যুগে আসি আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

এ সম্পর্কে সম্পাদকীয় নিবন্ধে নজরুল লিখলেন, 'ধূমকেতু' কোনো সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যধর্মই সব চেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।'

বস্তুত নজরুল-কাব্যের সর্বত্রই এই মনুষ্যধর্মের কথা ছড়িয়ে আছে।

আর এই 'ধূমকেতুকে'ই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন :

আয় চলে আয় ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনে এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

কাজী নজরুল ইসলামের টেলিগ্রাম পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'কে এই বলে অভিনন্দিত করেছিলেন, এ উপলক্ষে আশীর্বাদ প্রার্থনার উত্তরে কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'ধূমকেতু' সম্পাদককে লিখেছিলেন :

'তোমাদের কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে

পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।'

শরৎচন্দ্রের এই নির্দেশকে 'ধূমকেতু' সম্পাদক অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তাঁর সাপ্তাহিকটির প্রতি সংখ্যায় নির্ভয়ে সত্য কথা প্রকাশ করে।

'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়—১৯২২ সালে এমন কথা স্পষ্ট করে বলার সাহস খুব বেশি লোকের ছিল না বিশেষ করে লিখিত ভাবে। শুধু এই ঘোষণাই নয়, ত্রয়োদশ সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে স্পষ্ট করেই নজরুল লিখেছিলেন, 'স্বরাজটরাজ বুঝিনা, কেননা ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না।...যাঁরা এখন রাজা বা শাসক (ইংরেজ) এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে।'

এমনি কড়া কড়া কথাই নজরুল ক্রমাগত লিখে চলেছিলেন তাঁর 'ধূমকেতু'র পৃষ্ঠায় এবং বৃটিশ রাজপুরুষরাও ওৎ পেতে ছিলেন কখন তাঁরা এই দুর্বিনীত কবি--সম্পাদকের স্পর্ধা চূর্ণ করার সুযোগ গ্রহণ করবেন। প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে প্রতি সংখ্যাতেই নজরুলের এমন একাধিক আগুনে লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়ে আসছিল যার যে কোনোটির জন্যেই সম্পাদককে অভিযুক্ত করা চলতো।

কিন্তু সরকার কিছু দিন অপেক্ষা করে বিদ্রোহী কবিকে হেনস্তা করার একটা মস্ত বড়ো সুযোগ পেয়ে গেলেন। আত্মপ্রকাশের এক মাস এগারো দিন পরে 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যা বেরোয় এবং তাতে নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক যে অবিস্মরণীয় কবিতাটি প্রকাশিত হয় তারই জন্যে 'ধূমকেতু'র ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষিত হয় এবং সম্পাদককে রাজদ্রোহের অভিযোগে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা হয় অনেক খোঁজাখুঁজির পর। পূজাসংখ্যা 'ধূমকেতু' বাজারে বেরুবার মুখেই নজরুল ফেরারী হয়ে এদিক সেদিক ছদ্মবেশে

ঘোরাঘুরি করে বিহারের সমস্তিপুর হয়ে কুমিল্লায় গিয়েছিলেন। পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও তাঁর সন্ধান করতে পারে নি অনেকদিন অথচ তাঁর অগ্নিক্ষরা রচনাবলী বক্ষে ধারণ করে 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হতে থাকে। দেওয়ালী সংখ্যায় ফেরারী সম্পাদক শ্যামাপূজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে ভয়ংকর ভাষায় 'ময় ভুখা হুঁ' শীর্ষক যে হাড়-কাঁপানো প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ইংরেজ-রাজ ও তাঁদের ভারতীয় তাঁবেদারদের লক্ষ্য করে, তা যে সরকার বরদাস্ত করতে পারবে না সেটা ধবে নিয়েই ঐ সংখ্যাটি গোপনে রাতারাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল গ্রাহক-অনুগ্রাহকদের মধ্যে। দেওয়ালী সংখ্যা 'ধূমকেতু' পুলিশের হাতে পড়েনি এবং 'ময় ভুখা হুঁ' প্রবন্ধটির এখন আর হদিস পাওয়া যায় না।

তবে 'ধূমকেতু' পূজা সংখ্যার যে অতি বিখ্যাত 'অনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটিব জন্য বিদ্রোহী কবিকে অভিযুক্ত, দণ্ডিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, সম্পূর্ণত না হলেও সেই কবিতার অনেকটাই এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে 'ধূমকেতু' তথা কবি নজরুলের মর্মবাণী যথাযথ উপলব্ধির জন্যে। কবিতাটিতে কবি লিখেছেন :

আর কতকাল থাকবি বেটি
  মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
  অত্যাচাবী শক্তি চাঁড়াল,
দেবশিশুদের মারছে চাবুক,
  বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ-কসাইখানা,—
  আসবি কখন সর্বনাশী।
সুরেন্দ্র আজ মন্ত্রণা দেন
  দানব রাজার অত্যাচারে,
দম্ভ তাঁহার দম্ভোলি ভীম
  বিকিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজারে!

বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ আজি
করুণ সুরে বংশী বাজায়,
বুড়িগঙ্গার পুলিন বুকে
বাঁধছে মাটি দস্যু রাজায়।
রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে
দিক হতে আজ দিগন্তরে,
সে কর শুধু পশল না মা
বদ্ধ কারার অন্ধ ঘরে।
গগন পথে রবি রথের
শত সারথী হাকায় ঘোড়া,
মর্ত্ত্যে দানব মানব পিঠে
সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া!
তাজ হারা যার নাঙ্গা শিরে
গরমাগরম পড়ছে জুতি,
ধর্ম্মের কথা তারাই বলে
তারাই পড়ে কেতাব পুঁথি।
... ...
বুদ্ধি বুড়ো সিদ্ধিদাতা,
গনেশ টনেশ চাইনা রণে,
... ...
... ...
কলা বৌয়ের গলা ধরে
দাও করে দূর, দাও করে দূর,
ঐ বুঝি দেব সেনাপতি
ময়ুর চড়া জামাই ঠাকুর?
দূর করে দে, দূর করে দে
এসব বালাই সর্বনাশী,
চাই নাকো ঐ ভাঙ্ খাওয়া শিব

সেক গিয়ে তায় গঙ্গা মাসী'
তুই একা আয় পাগলী বেটী
তাথৈ তাথৈ নৃত্য করে,
... ...
... .
আর এলিনা ভবানী তুই
জানিনা কেউ ডাকল কিনা,
রাজপুতনায় বাজল হঠাৎ
ময় ভুখা হুঁর রক্ত বীণা।
ময় ভুখা হুঁর রক্ত ক্ষেপি
ছিন্নমস্তা আয় মা কালী,
গুরুবাগের শিখ সেনা আজ
হুঁঙ্কারে ঐ জয় মা কালী।
বৃথাই গেল সিরাজ টিপু
মীরকাসেমের প্রাণ বলিদান,
চণ্ডী লিখি যোগমায়ারূপ
বললে সবাই বিধির বিধান।

দীর্ঘ ঐ কবিতাটির শেষ কয়েকটি পংক্তিতে বলা হয়েছে ঃ

বছর বছর এ অভিনয়—
অপমান তোর পূজা নয় এ,
কি দিস আশিস কোটি
ছেলের প্রণাম চুরির বিনিময়ে।
অনেক পাঠা-মোষ খেয়েছিস
রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা,
আয় পাষাণী এবার নিবি
আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলদের বলি দিয়ে
ভীরুর হীন শক্তিপূজা,

দূর করে দে, বল মা,
ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা।
সেইদিন জননী তোর
সত্যিকারের আগমনী,
বাজবে বোধন-বাজনা
সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ম্যয় ভুখা হুঁ মায়ি' বলে
আয় এবার আনন্দময়ী,
কৈলাস হতে গিরি-রানীর
মা দুলালী কন্যা অয়ি!
আয় উমা আনন্দময়ী'!

এই রচনাটির জন্যেই বিদ্রোহী কবি নজরুলকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হতে হয়েছে এবং এ জন্যে ১৯২১-২২ সালের মতো ১৯২৩ সালও নজরুল-জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর হয়ে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারকালে নজরুল যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন সেটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজদ্রোহীদের জবানবন্দীর মধ্যে এক অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান অধিকার করে রয়েছে। ঐ জবানবন্দীটি প্রথমে বাংলা ১৩২৯ সালের (১৯২৩) 'ধূমকেতু'র ১৩ মাঘের সংখ্যায় এবং পরে বর্মণ পাব্লিশিং হাউস থেকে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে সেই ঐতিহাসিক জবানবন্দী ও বিচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ও তার চারধার সেদিন লোকে লোকারণ্য। তারিখ ৮ জানুয়ারী, সোমবার, ১৯২৩। কোর্টের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। তাঁর বিচার হবে রাজদ্রোহের অভিযোগে। বিচারক চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো আসামীকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বলার কিছু আছে কিনা। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কবি তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত কণ্ঠে বলে চললেন:

আমার উপর অভিযোগ আমি রাজদ্রোহী। তাই আমি আজ

রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর জন সত্য -হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত, রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান।...

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ; আমার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ। রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।...

আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ। সত্য স্বয়ম্ প্রকাশ। তাকে কোন রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম্ প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চিরসত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা; বীণা ভাঙলে ভাঙতেও পারে, কিন্তু ভগবানকে ভাঙবে কে?...

একথা ধ্রুব সত্য যে, সত্য আছে—চিরকাল ধরে আছে এবং চিরকাল ধরে থাকবে। যে আজ সত্যের বীণাকে রুদ্ধ করেছে, সত্যের বীণাকে মূক করতে চাচ্ছে, সে-ও তাঁরই এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৃষ্টির অণু। তাঁরই ইঙ্গিতে, আভাসে, ইচ্ছায় সে আজ আছে, কাল হয়ত থাকবে না। নির্বোধ মানুষের অহঙ্কারের অন্ত নেই। সে যাহার সৃষ্টি, তাঁকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন তার চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

আমার হাতের বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হয় না। কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফুঁ দিতে পারি। সুর আগের বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশীর সৃষ্টির কৌশলে।—

দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়—দোষ তাঁর, যিনি অন্যের কর্ণে তাঁর বীণা বাজান।···প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণা-বাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।

আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য, তেজ আর প্রাণ। কেন না, আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা; উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্যবারি, আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি আজ এই আসামীর পশ্চাতে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার প্রহসন করে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পেছনে এসে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি, তার আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়েছিলেন। সম্রাটের ভয়ে তার বিবেক, তার দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছলো।...

বিচারক জানে আমি যা বলছি, যা লিখছি, ভগবানের চোখে তা অন্যায় নয়; ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়; কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার; সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের; সে স্বাধীন নয়—রাজার ভৃত্য।···

আজ ভারত পরাধীন। অন্যায়কে অন্যায় বললে এ-রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ! এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায় এবং দিনকে রাত বলানো

—এ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন সায় দিয়ে সত্য উদাসীন ছিল বলে! কিন্তু সত্য আজ জেগেছে, তার চক্ষুষ্মান, জাগ্রত আত্মা মাত্রেই বিশেষরূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন বন্দী-সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী?...

কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই। লাভ-লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই। কেননা, আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার আত্মার নয়; আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।...

আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয় তূর্য বেজে উঠেছিল। সে সর্বনাশা নিশান-পুচ্ছ মন্দিরের দেবতা নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস-নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব সূচনা। আমি তাই নির্মম, নির্ভীক, উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম। তাঁর রক্ত-আঁখির হুকুম আমি ইঙ্গিতে বুঝেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম আমি সত্যরক্ষক, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লালসৈনিক। বাঙলার শ্মশানের মায়া-নিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তা' দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি।

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনেছি আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলা শেষের শেষ খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্তউষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ততারার আর উদয়তারার আলোর মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।...

আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নিমশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং ভগবান। অতএব মাভৈঃ। ভয় নাই।

এই অপূর্ব ঐতিহাসিক জবানবন্দীটি 'ধূমকেতু' সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বসে রচনা করেছিলেন ১৯২৩-এর ৭ই জানুয়ারী দুপুরবেলা। জবানবন্দীর তলায় আসামী কবি-সম্পাদক নিজেই তা লিখে রেখেছেন। পরদিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর এজলাসে কবির রুদ্ধকণ্ঠে তা পঠিত হয়েছিল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে।

এ জবানবন্দীও এক অতুলনীয় কাব্যখণ্ড। সাহসিকতায় ও চিন্তা-শীলতায় অনন্য। বক্তব্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধন্য ধন্য রোলে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা হলে কি হবে, ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো 'ধূমকেতু'র কবি-সম্পাদককে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বিচারক যে তাঁকে তেমন একটা দণ্ডই দেবেন সে অনুমান করে নজরুল তাঁর জবানবন্দীতে পূর্বেই বলেছেন, 'বিচারক জানে আমি যা বলছি, যা লিখছি, ভগবানের চোখে তা অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়; কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার; সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের; সে স্বাধীন নয় —রাজার ভৃত্য।' কী স্বচ্ছ দৃষ্টি ও অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী! একবিংশ সংখ্যা পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু'র সম্পাদক ছিলেন। অন্যের সম্পাদনায় আরো কিছুকাল চলার পর 'ধূমকেতু' বন্ধ হয়ে যায়।

দণ্ডাদেশ ঘোষণার পর কোর্ট থেকে বিদ্রোহী কবিকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকেই বিদ্রোহী কবি হলেন

বন্দী কবি। পরবর্তী অধ্যায়ে বন্দী কবি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তার আগে নজরুল সাংবাদিকতায় 'ধূমকেতু'র আবির্ভাবের পূর্বেই যে বিদ্রোহের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন এখানেই সে সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

মাত্র একুশ বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রধান সহায়ক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন 'নবযুগ' নামক একখানি সান্ধ্য দৈনিকের যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক সাহেব। একদিকে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও কৃষক মজদুর জাগরণ সম্ভব করে তোলাই ছিল এই পত্রিকা-খানির লক্ষ্য। প্রথম থেকেই 'নবযুগ'-এ এমন সব কড়া কড়া প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন নজরুল যার ফলে পত্রিকাটির জামানতের হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। আবার দু' হাজার টাকা জামানত রেখে 'নবযুগ' চালু রাখা হলে বটে কিন্তু নজরুল এই কাগজের চাকরি ছেড়ে দিলেন। 'নবযুগে' প্রকাশিত তাঁর সে সময়ের কতকগুলি অগ্নিক্ষরা প্রবন্ধের সঙ্কলন ১৯২২ সালে নজরুল নিজেই 'যুগবাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন বটে কিন্তু সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে তার প্রচার বন্ধ করে দেয়। 'ধূমকেতু'র আত্মপ্রকাশে সে বছরেই সারা বাঙলা জুড়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

শ্রমজীবী সমাজের হয়ে নজরুল কলমের লড়াই চালিয়েছেন প্রথম পর্যায়ের 'নবযুগ'-এর অন্যতম সম্পাদক রূপে। তাঁর তখনকার বাছাই বাছাই প্রবন্ধাবলী (ধর্মঘট, উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন, ছুৎমার্গ, মুখবন্ধ প্রভৃতি) নিয়েই 'যুগবাণী' গ্রন্থটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। সেখানে যেমন উপেক্ষিত কৃষক-মজুরদের মধ্যে জীবন-সঞ্চারে কবি ব্রতী হয়েছিলেন, 'ধূমকেতু'কে তেমনি তিনি করে নিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের জাগরণের হাতিয়ার। 'ধূমকেতুর পথ' প্রবন্ধে নজরুল বলেছেন, 'বিদ্রোহ করতে হ'লে সকলের আগে আপনাকে জানতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ !' ১৯২২ সালেই 'কামাল' শীর্ষক এক

সম্পাদকীয় নিবন্ধে সম্পাদক লিখেছেন, 'যাক, এতদিন পর একটা ছেলের মত-ছেলে ব্যাটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরতেও আর আপত্তি নাই।...দাড়ি রেখে, গোস্ত খেয়ে, নামাজ রোজা করে যে খিলাফৎ উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না তা সত্য-মুসলমান কামাল বুঝেছিল;...ঐ কামালের নামে বেরিয়ে পড় 'বোম কেদার নাথ' ব'লে। আপনি আল্লা ভগবান সবাই সহায় হবে তোমার।' স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মবলিদানে আগ্রহী একটি করে ছেলেকে তিনি চেয়েছেন তাঁর 'ভিক্ষা দাও' প্রবন্ধে। স্বভাবতই এসব রচনা বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে সে সময়ে সর্বসাধারণের মধ্যে।

সাংবাদিকতায় সাফল্যের আরো স্বাক্ষর রেখেছিলেন নজরুল ১৯২৫-এর .. এপ্রিল তারিখে প্রথম প্রকাশিত জাতীয় কংগ্রেসের লেবার স্বরাজ পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'লাঙল' এবং চার মাস চলার পর 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যাবার পর তার স্থলবর্তী সাপ্তাহিক 'গণবাণী'তে। এ দু'খানি কাগজে সম্পাদক হিসাবে যথাক্রমে মণিমোহন মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গাধর বিশ্বাসের নাম থাকলেও কাগজ সম্পাদনার পুরো দায়িত্ব ছিল কাজী নজরুলের। হয়তো রাজরোষের মাত্রাটাকে সীমিত রাখার জন্যে নিজের নামটা এ দু'টি পত্রিকায় তিনি সম্পাদক হিসাবে ব্যবহার করতে দেননি। যাই হোক, 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যাতেই বিদ্রোহী কবির বহুখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি ('সর্বহারা' কাব্য সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত) প্রকাশিত হয়েছিল যাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুস্লিম-ক্রীশ্চান।

মার্কসীয় দর্শনের সাম্যবাদ না হলেও বিদ্রোহী নজরুল এই কবিতাতেই নিজস্ব সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই' এবং 'অভেদ ধর্মজাতি' ও দেশের 'যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই' বলে ঘোষণা করেছেন। 'লাঙল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত যথাক্রমে 'কৃষাণের গান' ও 'সব্যসাচী' কবিতা

দু'টিও তখন খুব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম কবিতাটিতে অর্ধমৃত কৃষকদের জাগ্রত হবার আহ্বান জানিয়ে কবি বলছেন :

ওঠরে চাষী জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙল
(আমরা) মরতে আছি ভালো করেই মরব এবার চল্‌।

আরো বলেছেন কবি :

আজ জাগরে কৃষাণ, সব ত গেছে কিসের আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎজয়।

বাঙলার কৃষক সমাজ তাঁদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সন্ধান পেলেন হৃদয়স্পর্শী এই গানটির রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে।

তৃতীয় সংখ্যা 'লাঙল'-এ দেশবাসীকে অভয় জানিয়ে নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'সব্যসাচী' কবিতায় লিখলেন :

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী !
গৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী।
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি।'
নব-যৌবন জলতরঙ্গে নাচেরে প্রাচীন প্রাচী !

এই কবিতার উপসংহারে দেশবাসীর চূড়ান্ত দৈন্যকে ফুটিয়ে তুলে কবি লিখেছেন :

বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি।

নজরুল তখন থাকতেন কৃষ্ণনগরে। সপরিবারেই থাকতেন। বিয়ে করেছিলেন তিনি কুমিল্লা শহরের মেয়ে প্রমীলাকে (দুলি)। তাঁদের বিয়ে হয়েছিল কলকাতায় ১৯২৪-এর ২৪শে এপ্রিলে। কুমিল্লায় কবির খুব যাতায়াত ছিল কান্দিরপাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে। সে বাড়ির সাহিত্য ও সঙ্গীতের পরিবেশটি কবির খুব ভালো লাগতো। ইন্দ্রকুমারের ছেলে বীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর মাকে কবি নিজের মায়ের মতোই দেখতেন

এবং মা বলেই ডাকতেন। এই মাতা বিরজাসুন্দরীকেই 'সর্বংসহা সর্বহারা জননী আমার!' বলে আহ্বান জানিয়ে নজরুল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যসঙ্কলন 'সর্বহারা' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন। ইন্দ্রকুমারের পরলোকগত জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী গিরিবালা দেবী ও তাঁর কন্যা প্রমীলাও একই বাড়িতে থাকতেন এবং সেই প্রমীলার সঙ্গেই নজরুলের বিয়ে হয়।

বিয়ের পর নজরুল সস্ত্রীক হুগলীতে যান বিপ্লবী নায়ক ভূপতি মজুমদারের আহ্বানে। এক হিন্দুকন্যাকে বিয়ে করায় অনেকের বিরূপতা সত্ত্বেও মাত্র কিছুকাল বিদ্রোহী কবি জেল থেকে আসায় তাঁকে নিয়ে সর্বত্র তখন টানাটানি। অভিনন্দনে অভিনন্দনে তখন তিনি অস্থির। তা ছাড়া সব ধর্মই তাঁর কাছে মহান এবং কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামিই তিনি বরদাস্ত করতে নারাজ, এতো তিনি অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন।

সে সময়ে তারকেশ্বরের যে মোহান্তকে অপসারণের জন্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে সেই মহান্তকে লক্ষ্য করে 'মোহ-অন্তের গান' শীর্ষক যে গানটি নজরুল রচনা করেন তাতে বলা হয়ঃ

জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী
ঐ ডুবালো পাপ চণ্ডাল
তোদের বাঙলাদেশের কাশী।

সে গানে আরো লেখা হয়ঃ

এই সব ধর্মঘাগী
দেবতায় করছে দাগী
মুখে কয় সর্বত্যাগী
ভোগ নরকে ব'সে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব দেউলে পশে
আর ভক্ত তোরা পূজিস তারেই, যোগাস খোরাক সেবাদাসী!
জাগো বঙ্গবাসী॥

কবির 'ভাঙার গান' বইতে এ গানটি সন্নিবেশিত হয়েছে।

ধর্মান্ধ মোল্লা-মৌলবী-ইমামদেরও তিরস্কারে জর্জরিত করতে কসুর করেননি নজরুল। নজরুল-কাব্য নিয়ে এক শ্রেণীর গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দু যখন নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করে চলছিলেন সে সময় বিদ্রোহী কবি 'আমার কৈফিয়ৎ' নামের অপূর্ব কবিতাটিতে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও মানবদরদের যে পরিচয় রেখে গিয়েছেন তার তুলনা হয়না। গোঁড়া মুসলমানের কাছে তিনি কাফের এবং গোঁড়া হিন্দুর কাছে তিনি যবন। কিন্তু যে যাই বলুক নজরুল তাতে কিছু ভ্রূক্ষেপই করতেন না, সবই সহ্য করে যেতেন। মানুষ এবং বাঙালী—এই পরিচয়টাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে গৌরবের। তাই 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ তিনি অনায়াসে লিখতে পারলেন :

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী',
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি !

... .

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লারা' ক'ন হাত নেড়ে,
দেবদেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে।
ফতোয়া দিলাম কাফের কাজী ও
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও !
'আম পারা' পড় হাম্-বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে
হিন্দুরা ভাবে 'পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পাত নেড়ে।'

... ...

বন্ধুগো আর বলিতে পারিনা বড় বিষ জ্বালা এই বুকে।
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা
তাই লিখে যাই এ-রক্ত লেখা
বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !
পরোয়া করিনা, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।

প্রার্থনা ক'রো,—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !

এই উদার মানবতার দৃষ্টিভঙ্গি ছেলেবেলা থেকেই কবি নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে বজায় রেখেছিলেন তা সকলেই স্বীকার করেন।

যাই হোক, হুগলীতে সপরিবারে থাকার সময়ে প্রতিদিনই কবির বাড়িতে বিপ্লবী ও রাজনীতিক কর্মী ও নেতাদের এবং কবি-সাহিত্যিকদের ভিড় লেগেই থাকতো। কবির হুগলীতে অবস্থান কালটি নানা কারণে স্মরণীয়। সেখানেই এক জন্মাষ্টমী দিনে কবির প্রথম পুত্রলাভ ঘটেছিল বলে তিনি সে পুত্রের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ। দুঃখের বিষয় কয়েক মাস পরেই শিশুটিকে হারাতে হয়।

দেশের কাজে এবং তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিশ্রামের জন্যে দার্জিলিঙ গিয়ে সেখানেই ১৯২৫-এর ১৬ই জুন তারিখে (বাংলা ১৩৩২ সালের ৩রা আষাঢ়) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হুগলীর বাড়িতে বসেই দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের সংবাদ পরদিন শোনার সঙ্গে সঙ্গেই দশ মিনিটের মধ্যে 'অর্ঘ্য' নামে একটি গান রচনা করে এবং তাতে সুর দিয়ে মর্মাহত ভক্ত কবি নজরুল মহান নেতার উদ্দেশে তাঁর শোক-শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। অশ্রুবিন্দুতে গাঁথা সে গানের মালায় অতুলনীয় কথায় কবি গাইলেন :

হায় চির ভোলা ! হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু গরল পিয়া !
কেন এত ভালবেসেছিলে তুমি
এই ধরণীর ধুলি ?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে
স্বর্গে লইল তুলি।

তিনদিন পর কবি 'অকাল সন্ধ্যা' নামে আরেকটি গান রচনা করেন। দেশবন্ধু হারানোর বেদনায় খালি পায়ে শোকমিছিলে বেরিয়ে পড়ে হুগলীর পথে পথে খোলা গলায় গাইতে থাকেন :

খোলো মা দুয়ার খোলো
প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো,
দুপুরেই ডুবলো দিবাকর গো।

মহান নেতা চিত্তরঞ্জনকে হারিয়ে বড়ই অধীর হয়ে পড়েছিলেন ভক্ত নজরুল এবং একের পর এক অনেকগুলি কবিতা ও গান লিখে ফেলেছিলেন যেগুলি একত্র করে তিনি 'চিত্তনামা' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন মাতা বাসন্তী দেবীর নামে উৎসর্গ করে।

'অকাল সন্ধ্যা'র পাঁচ দিন পর 'ইন্দ্রপতন' নামে একটি মস্ত বড়ো কবিতা লিখলেন নজরুল এবং তার পাঁচ দিন পর একটি ঘরোয়া শোক-সভার জন্যে 'সান্ত্বনা' শীর্ষক আরেকটি নাতিদীর্ঘ কবিতা। তার পরের দিনই কবি তাঁর বিখ্যাত 'রাজ-ভিখারী' গানের অঞ্জলি নিবেদন করেন দেশবন্ধুর উদ্দেশে। 'সান্ত্বনা' কবিতায় যথার্থই বলা হয়েছে :

স্ব-রাজ দলের চিত্ত-কমল লুট্‌ল বিশ্বরাজের পায়,
দলের চিত্ত উঠ্‌ল ফুটে শতদলের শ্বেত আভায়!
রূপের কুমার আজকে দোলে
অপরূপের শীষ মহলে,
মৃত্যু বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ঐ গো যায়,
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায়!

'ইন্দ্রপতন' কবিতায়ও কবি নজরুল দেশবন্ধুর দেহত্যাগের এক অভিনব ও অন্তরস্পর্শী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কবি একস্থানে লিখেছেন :

মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি তোমার প্রাণ,
কালো মুখ তার হ'ল আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান।
অগুরু-পুষ্প-চন্দন পু'ড়ে হ'ল সুগন্ধতর—
হ'ল শুচিতর অগ্নি আজিকে, শব হ'ল সুন্দর।

ধন্য হইল ভাগীরথী-ধারা তব চিতা ছাই মাখি,
সমিধ হইল পবিত্র আজি কোলে তব দেহ রাখি।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে হুগলী-চুঁচুড়ার সম্মিলিত বিরাট শোক-সভার উদ্বোধন হয়েছিল নজরুলের উদাত্ত কণ্ঠে দীর্ঘ 'ইন্দ্রপতন' কবিতাটির আবৃত্তি দ্বারা এবং সমাপ্তি সঙ্গীতও কবিই গেয়েছিলেন— তাঁরই রচিত সেই 'রাজ-ভিখারী' গান যার শেষ কলিতে বলা হয়েছে :

দিল না ভিক্ষা, নিলনাক দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী !
যে জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি।

চিত্তরঞ্জন ছাড়াও কবি নজরুল ইসলাম আরো অনেকের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে কবিতা লিখেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'চিরঞ্জীব জগলুল', 'সত্য-কবি' ও 'সত্যেন্দ্র প্রয়াণ গতি', 'মিসেস্ এস রহমান', 'মা বিরাজাসুন্দরী দেবীর শ্রীচরণারবিন্দে' এবং 'গোকুল নাগ' প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এসব ছাড়া গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আশুতোষ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতির ওপর প্রণতিজ্ঞাপক কবিতা তো আছেই।

এখানে বিশেষভাবে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৪ সালে দ্বিতীয়বার যখন ভূপতিবাবু সদ্য-বিবাহিত নজরুলকে হুগলীতে নিয়ে যান তার কিছু দিন বাদেই সেখানে আসেন সদলবলে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মাজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়ে সে সময়ে কবি লিখলেন ঃ

আজ না চাওয়ার পথ দিয়ে কে এলে ?
কংস কারার দ্বার ঠেলে
শব শ্মশানে শিব নাচে ঐ
ফুল ফুটানো পা ফেলে।

স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীর এই অভ্যর্থনা-সঙ্গীতটি খুবই ভালো লেগেছিল। অনেকটা এ ধরনেরই আরেকটি গান নজরুল কুমিল্লায় বসে রচনা করেছিলেন প্রমীলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার ঠিক আগে এবং গানটির নাম দিয়েছিলেন 'পাগল পথিক'। 'প্রলয় রাগে নয়রে এবার ভৈরবীতে

দেশ জাগাতে' যিনি ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি কে? এ প্রশ্ন তুলেই কবি বলছেন :

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ-গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়।

গান্ধীজীর ওপর নজরুলের কয়েকটি গান এবং কবিতাতেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। এমন কি দু'জনেই 'চরকার গান' নাম দিয়ে দু'খানি গান রচনা করেছেন। ছন্দের রাজা সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার ঘর্ঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর। ঘর ঘর সম্পদ আপনার নির্ভর।' বলে গানটি গাইতে শুরু করলেই শ্রোতৃবর্গের মন নিঃসন্দেহে আন্দোলিত হতে থাকে, তবে নজরুলের চির-আকাঙ্ক্ষিত হিন্দু-মুসলমান মিলন-সূত্রের ভিত্তি হিসাবে চরকাকে 'স্বরাজ-সিংহ দুয়ার' বলে গণ্য করায় তাঁর রচিত 'চরকার গানটি'ও খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সে গানটিতে কবি নজরুল লিখেছেন ঃ

ঘোর
ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।
তোর ঘোরার শব্দে তাই,
সবাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ-সিংহ-দুয়ার আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর॥
ঘর ঘর তুই ঘোররে জোর
ঘর্ঘর ঘর ঘূর্ণিতে তোর
ঘুচুক ঘুমের ঘোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুরচাকাতে বলদর্পী তোপ কামানের টুটুক জোর।

'গান্ধীজী' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ যেমন অহিংসার সাধক মহাত্মা গান্ধীকে 'বুদ্ধের কোলে, টলস্টয়ের পাশে' দেখিয়েছেন, নজরুলও তেমনি তাঁর 'সত্য-মন্ত্র' গানে অনেকটা সে সুরেই বলেছেন ঃ

চিনেছিলেন খ্রীষ্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহম্মদ ও রাম—
মানুষ কী আর কী তার দাম।
(তাই) মানুষ যাদের করত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলেন স্থান,
গান্ধী আবার গান সে গান।

এই সব কবিতা ও গানে অহিংসার ঋষি মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি কবি নজরুলের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলেও প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র বিদ্রোহের সাহায্যে পরশাসন থেকে মুক্তিলাভের দিকেই ছিল তাঁর ঝোক। তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা' ও 'ভাঙ্গার গান' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থগুলির অধিকাংশ রচনার মধ্যেই বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত। 'বিষের বাঁশী' বইখানি থেকে 'বিদ্রোহীর বাণী' শীর্ষক কবিতায় নজরুল বলছেন :

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই কর্‌ব সেথাই বিদ্রোহ!
ধামাধরা! জামা ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো।
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন কর্‌ব দেশ!
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি—মর্‌ব শেষ।

জীবনের শেষদিন পযন্ত সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানেও এই বিদ্রোহের ঘণ্টা ধ্বনিই করে গেছেন কবি নজরুল। সেই দিক থেকে তাঁর এই 'বিদ্রোহী কবি' পরিচিতিটি সার্থক। তাঁর প্রেমের কবিতা ও প্রেমের গানেরও যেন শেষ নেই। তথাপি দেশের কিশোর ও তরুণ সমাজের কাছে নজরুলের বিদ্রোহাত্মক ও দেশাত্মবোধক অর্থাৎ দেশপ্রেমমূলক কবিতা ও গানের আকর্ষণই সর্বাধিক। বন্দী কবি হিসাবে কারা-জীবনে যে সমস্ত কবিতা এবং গান তিনি রচনা করেছেন সেগুলিতেও বিদ্রোহের অগ্নিজ্বালা এবং দেশপ্রেমের সুর ধ্বনিত। এবার বন্দী কবির রচনা ও তাঁর বন্দী জীবনের ওপরেই কিছু আলোকপাত করা যাক।

বন্দী কবি

কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে প্রাক স্বাধীনতার আমলে কোনো উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিককে কারাবরণ করতে হয়নি। এদিক দিয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল সারা ভারতে এক অনন্য পুরুষ। এই বন্দী কবি বিদ্রোহী কবিরই আরেক রুদ্ররূপ। কারাজীবনে কাব্য রচনায় বিদ্রোহের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন নজরুল।

খুবই দুঃখের কথা, সেদিনের ইংরেজ চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুইন হো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়ে কাজী নজরুলের মতো এত বড়ো একজন কবিকেও সম্মানজনক কোনো বিশেষ শ্রেণীতে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন নি। বিচার শেষে বাঙলার জাতীয় কবিকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেই নিয়ে রাখা হলো। কবি এসব লাঞ্ছনা ও অপমানকে স্বদেশ-জননীর আশীর্বাদ হিসাবেই গ্রহণ করলেন। কয়েদীদের জীবনের বেদনায় তিনি আহত বোধ করলেন।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বেশিদিন রাখা হয়নি নজরুলকে। কিছু দিনের মধ্যেই বাঙলার সবচেয়ে যেটা খারাপ জেল, ভালো শিক্ষা দেবার অর্থাৎ শায়েস্তা করার জন্যে বিশেষ বিশেষ বন্দীকে এই জেলে নিয়ে আসা হতো নজরুলকেও নিয়ে আসা হলো সেখানে একেবারে হাতকড়া পড়িয়ে। বিদ্রোহী কবির এই দুর্দশা ও অপমানে হুগলী জেলের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এমন কি সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে একটা ক্ষোভ এবং বেদনার ভাব দেখা দিলেও সকলেই এই ভেবে খুশী যে নজরুলের আগমনে এই জেলের নিরানন্দ পরিবেশে অন্তত কিছুটা আনন্দের আমদানী হবে নিশ্চয়ই। কয়েকদিনের মধ্যেই সবার সেই আশা পূর্ণ হতে চললো। কবি সবকিছু দেখেশুনে অল্প সময়েই বুঝে নিলেন যে, বিশ্রী রকমের সাদা চামড়ার ইংরেজ জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আর্সটন এমনি রগচটা লোক যিনি সব সময়েই পঞ্চমে চড়ে থাকতেন এবং হাঁকডাক চিৎকারে জেলখানাটাকে

এক জন্মদিনে দুইপুত্র কাজী সব্যসাচী ও
কাজী অনিরুদ্ধের মাঝখানে কাজী নজরুল।

একেবারে মাথায় করে রাখতেন। খাওয়া দাওয়ায় এবং সর্ব রকমে বন্দীদের কষ্ট দিতে পারলেই সুপারের খুব আনন্দ হতো। তাই নজরুলের কলমে সুপার হয়ে গেল সুইপার এবং তিনি একখানি ব্যঙ্গ-গীতি লিখে ফেললেন 'সুইপার বন্দনা' নামে এবং আর্সটন নাম পাল্টে সুপারের নাম তিনি চালু করে দিলেন 'হর্সটন' বলে। যাই হোক 'সুইপার বন্দনা' গানটিতে বলা হলো ঃ

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে,
আমারি গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছ আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লপসী' শোভন তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সন্তুষ্টি,,
ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ তুমি ধন্য ধন্য হে।

যখনই জেল সুপারকে এক হাত নেবার দরকার হতো তখনই রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটির প্যারডি হিসাবে রচিত নজরুলের পূর্বোক্ত 'সুইপার বন্দনা' গানটি সমবেতভাবে গাইতে আরম্ভ করতেন জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা আর আর্সটন সাহেব রাগে একেবারে পাগলা হয়ে যেতেন। 'ভাঙার গান' সঙ্কলন গ্রন্থে সংগৃহীত এই গানটি সম্পর্কে ফুটনোটে কবি নিজেই লিখেছেন, 'হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড় কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।'

আর্সটন সাহেব রাজনৈতিক বন্দীদের কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধা দিতে নারাজ ছিলেন। ফলে চিঠিপত্র লেখায়ও তাঁদের অসুবিধা

হতো। খবরের কাগজ দেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যদিও হুগলী বিদ্যামন্দিরের স্বেচ্ছাসেবক এবং বিপ্লবী ছাত্র ও যুবদল হুগলী ব্রীজের ওপর থেকে জেলখানার ভেতরে পত্র-পত্রিকা, লেখার কাগজ-কলম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র ফেলে দিত বন্দীদের কষ্ট নিবারণের জন্যে। জেলখানার দেয়াল উঁচু করে দিয়েও আর্সটন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তাই সকালে-বিকালে জেল-প্রাঙ্গনে বন্দীদের বেড়ানো নিষিদ্ধ করে দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিহিংসা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হলেন। নিজেদের মধ্যে বন্দীদের আর কথাবার্তাও বলতে দেওয়া হতো না। এমনি অবস্থায় যে কবি ভাবাবেগে ফেটে পড়বেন, দারুণ রকমের একটা বিস্ফোরণ ঘটবে সেতো জানাই ছিল। তাই হলো। নজরুল একদিন চরম উত্তেজনায় প্ররোচিত হয়ে উচ্চৈস্বরে গেয়ে উঠলেন ঃ

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।

এ গান আগুন ধরিয়ে দিল জেল সুপার, জেলার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মনে। তাঁরা সলাপরামর্শ করে কবি নজরুল এবং তাঁর অনুরক্ত অপর কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে এমনভাবে সেলে নিয়ে আটক রাখলো যাতে তাঁরা অন্যবন্দীদের সংস্পর্শেই আর আসতে না পারেন। এ অবস্থায় সিংহশিশু কবি নজরুল যে আরো জোর গর্জে উঠবেন সে তো জানা কথাই। সে সময়েই জাতিকে বন্দী-কবি উপহার দিলেন আরেকখানি অবিস্মরণীয় গান যা 'শিকল পরার গান' নামে পরিচিত হয়ে আছে। সেলের লোহার

গরাদের সঙ্গে হাতকড়ার লোহা বাজিয়ে কবি যখন গানটি গাইতে শুরু করলেন অন্যেরাও অনেকে তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইলেন :

এই শিকল পরা ছল মোদের শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল !
তোমার বন্দী-কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা' নয় এ শিকল ভাঙা কল।

... .

ওরে, ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

এ যেন এক অভয় মন্ত্রের গান। বন্ধন ভয়কে উপেক্ষা করে সমস্ত অন্যায় অবিচারের প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে প্রতিরোধ-শক্তি জাগাবার জন্যে এমনি সব গান রচনা করে নজরুল যুব-চিত্তে অমর হয়ে আছেন। 'ভাঙার গান'টিও কবির বন্দী জীবনেরই রচনা। এবং এ নামে নজরুলের যে কাব্যগ্রন্থখানি রয়েছে তা তাঁর 'অগ্নিবীণা' এবং 'বিষের বাঁশী'রই সমগোত্রীয়।

নজরুল যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বুঝতে পারা যায় তাঁর এ সময়কার কয়েকটি কবিতা থেকে। হুগলী জেলের দারুণ উত্তেজনার পরিবেশে 'আনন্দমঠে'র সন্তানদলের মতো মুক্তিসংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন তিনি তাঁর নবরচিত 'সেবক' কবিতা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে যাতে তিনি বলেছেন :

সত্যকে হায় হত্যা ক'রে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কিরে কেউ সত্য-সেবক বুক ফুলে আজ দাঁড়ায় ?
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মারায়,
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানার) এই ভিত্তিটাকে নাড়ায় ?

'আনন্দমঠে' বর্ণিত দুর্গা ও কালীর রূপকে অবলম্বন করেই বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর 'জাগৃহি' নামক আগমনী কবিতাটি জেলে বসে রচনা করে থাকবেন। সে কবিতার ভীষণতা জেল কর্মচারীদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করবে, এ খুবই স্বাভাবিক।

এর পর থেকে জেলখানায় অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যেতে থাকে এবং সেই অবস্থায় বিদ্রোহী বন্দী কবির নেতৃত্বে হুগলী জেলের সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী সিদ্ধান্ত নিলেন আমরণ অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করার, তাতে সাধারণ কয়েদীরাও সামিল হলো। এর ফলে ঐ জেলে দেখা দিল এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

অনশন আরম্ভের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ প্রায়। এ উপলক্ষে অন্যায়ের প্রতিকারে মরণ-পণ সংগ্রামের মুখে নজরুল মরণকে শিবরূপে আহ্বান জানিয়ে 'মরণ-বরণ' গানখানি রচনা করে গাইলেন :

এসো এসো এসো ওগো মরণ।
এই মরণ ভীতু মানুষ মেষের ভয় করগো হরণ।
মুক্তি দাতা মরণ! এসো কাল-বোশেখীর বেশে,
মরার আগেই মরলো'যারা নাও তাদেরে এসে,
জীবন তুমি, সৃষ্টি তুমি জরা মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ।

এই কবিতায় কবির মূল বক্তব্য, মৃত্যুর মাধ্যমেই মৃত্যুভয়কে জয় করতে হয়।

'সেবক' কবিতার পরেই বোধহয় বন্দী কবি তখনকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বন্দী-বন্দনা' কবিতাটি রচনা করেন প্রতিদিন ভোরবেলায় হেড জমাদারের বন্দী গণনার জন্যে 'ফাইলে' দাঁড়ানো ও 'সরকার সেলাম' রীতির অপমানের প্রতিবাদে। বন্দী কবির এটি ছিল প্রভাতী সঙ্গীত। এ গানটি খুব ভোরে গেয়ে প্রতিদিন বন্দীদের কবি জাগিয়ে দিতেন। গানটিতে বন্দী কবি লিখেছেন :

আজি রক্ত নিশি ভোরে এ কি ও শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,

ঐ কাহারা কারাবাসে মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।
ওরা দুপায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে
বাজিল নভতলে বিজয় সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশে ছেড়ে
উতল কলরোলে।
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন
নিখিল গেহ যেথা বন্দী কারা, সেথা
কেনরে কারাত্রাসে মরিবে বীর দলে ?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভতলে ॥

... ...

'মরণ-বরণ' ও এই গানটির প্রসঙ্গে বন্দী নজরুল রচিত 'অভয়-মন্ত্র' শীর্ষক আরেকটি গানের কথাও মনে পড়ে যায় যাতে বলা হয়েছে ঃ

ঐ নির্যাতকের বন্দী কারায়
সত্য কি কভু শক্তি হারায় ?
ক্ষীণ দুর্বল বলে খণ্ড 'আমি'র হয় যদি পরাজয়,
ওরে অখণ্ড আমি চির-মুক্ত সে, অবিনাশী অক্ষয় !

এসব গানে গানে আগুনে পরিবেশ তৈরি হলো। হুগলী জেলে নির্দিষ্ট দিনে সেখানে বন্দীদের আমরণ ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণলেন এবং জোর জবরদস্তি করে নল দিয়ে খাইয়ে গোপনে অনশন ভাঙবার চেষ্টা করলে অনেকেই এবং বিদ্রোহী কবি নিজেও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে অনশনের চাপা-খবরটা বাঙলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। সম্মানজনক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চলতেই থাকবে, এ কথা শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সকলকে নিয়ে সসম্মানে বাঁচার জন্যে 'মরণ-বরণ' গানের ডাকে সকলকে

অনশনে নামিয়ে যখন সেই বিদ্রোহী বাউল চারণ-কবি হিসাবে গাইলেন :

মোরা ভাই বাউল চারণ
মানিনা শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি
অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
মরা-প্রাণ উট্‌কে দেখাই
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে॥

তখন সারা দেশ উৎকণ্ঠায় ছেয়ে গেল এবং কবিগুরুসহ জাতীয় নেতৃবর্গ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অনশনরত নজরুলকে হুগলী জেলে টেলিগ্রাম করে জানালেন, 'অনশন ত্যাগ করুন, আমাদের সাহিত্য আপনাকে চায়।' গুরুর এ নির্দেশ ভাবিত করে তুলেছিল বিদ্রোহী কবিকে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আবার ছাপার অক্ষরে 'শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু' বলে উৎসর্গীত ও তার নীচে স্বহস্তে স্বাক্ষরিত 'বসন্ত' নাটকখানি নজরুল-বন্ধু পবিত্র গাঙ্গুলীর হাত দিয়ে সরাসরি হুগলী জেলে পাঠিয়ে দিলেন। পবিত্রবাবু সদলবলে এবং যে বিরজাসুন্দরী দেবীকে নজরুল মা বলে ডাকতেন এবং যাঁকে তিনি তাঁর 'সর্বহারা' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁকে নিয়ে হুগলী জেলে গিয়ে একদিন হাজির হলেন। রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে এবং বিরজাসুন্দরী দেবী প্রভৃতির অনুরোধে জেলকর্তৃপক্ষ ধর্মঘটকারীদের দাবী মেনে নিলে বিদ্রোহী কবি সদলে অনশন ত্যাগ করলেন মাতা বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস পান করে। সম্মানজনক মীমাংসায় তাঁরা অনশন ভঙ্গ করলেন বটে কিন্তু দেশের স্বার্থে তাঁদের শহীদ হতে হলেও তাতে দুঃখ-শোকের কোনো কারণ থাকতো না। সে বিষয়ে কবি আগেই বলে রেখেছেন :

মৃত্যু এরা জয় করেছে, কান্না কিসের ?
আর-জন্ম-জন্ম আনলে এরা আপনি গিয়ে কলসী বিষের !
কে মরেছে ? কান্না কিসের ?
বেশ করেছে !
দেশ বাঁচাতে আপনারি জান শেষ করেছে !
বেশ করেছে '!

অনশন ভঙ্গের কিছু দিন পরেই হুগলী জেল থেকে নজরুলকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত কর হয় এবং সেখানে কবি গান-বাজনা নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তিতেই কারাবাসের বাকি দিনগুলি কাটিয়ে দিয়েছিলেন। এখানকার জেল সুপার বসন্ত ভৌমিক ছিলেন কবির খুবই গুণমুগ্ধ এবং তিনি তাঁকে একটি হারমনিয়াম জোগাড় করে দিয়েছিলেন।

এখানে নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দোলন-চাঁপা' বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখের প্রয়োজন। এই গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলিও জেলে থাকা কালেই লেখা। কবি তখন প্রেসিডেন্সী জেলের বিচারাধীন বন্দী। এ বিষয়ে গ্রন্থ-প্রকাশকের (ব্রজবিহারী বর্মণ) বক্তব্যে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্সী জেলে অবস্থানকালেই কবি তাঁর চতুর্থ বই (কাব্যগ্রন্থ হিসাবে দ্বিতীয়) 'দোলন চাঁপা' রচনা করেন। জেল কর্তৃপক্ষের অগোচরে তাঁর সবগুলো কবিতাই বাইরে পাচার করে দেওয়া। পবিত্রদা (শ্রীযুক্ত পবিত্র গাঙ্গুলী) ওয়ার্ডারদের যোগাযোগে তা বার করে আনেন এবং কবির নির্দেশমত 'আর্য পাবলিশিং হাউসে'র কর্মকর্তাদের হাতে প্রকাশ ভার দেন। যথা সময়ে তা প্রকাশ করা হয়।'

বন্দী জীবনে রচিত হলেও 'দোলন-চাঁপা' বইখানি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত মানবিক প্রেমের কবিতায় গ্রথিত, সেখানে কোনো বিদ্রোহ-বিপ্লবাত্মক বা কোনো দেশপ্রেমমূলক কবিতা বা গান সংকলিত হয় নি। এই কাব্য-সঙ্কলনখানিতে 'পূজারিণী', 'অবেলার ডাক', 'অভিশাপ' প্রভৃতি কয়েকটি বড়ো-ছোট রোমান্টিক কবিতা রয়েছে। তবে 'পূজারিণী'ই এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা যেখানে বিবাহ-পূর্ব প্রণয়িনী

প্রমীলার শুদ্ধ ভালোবাসাকে স্মরণ করে তাঁকে 'চিরপরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধরে মোর অনাদৃতা সীতা' বলে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছেন :

ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন
অবহেলে শুধু ভালোবেসে।
ভেবেছিনু, দুর্বিনীত দুর্জয়ীরে জয়ের গরবে
তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তারপর একদিন
তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া
বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে।

বন্দী জীবনের আগে রচিত (১৯২২) এবং মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদকে উৎসর্গীত 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বহু আলোচিত 'বিজয়িনী' কবিতাটিও একই সুরের। এখানেও বিদ্রোহী কবি রণক্লান্ত হয়ে তাঁর প্রেমাস্পদা প্রমীলাকে বিজয়িনী রূপে আহ্বান জানিয়ে তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের সুরে বলছেন :

হে মোর বাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে
আমার বিজয় কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে ওঠে ভারী
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে
... ...
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।

দিনে দিনে রণক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাঁর 'সমর-জয়ী অমর তরবারী'-খানি যখন তাঁর কাছে ভারী বলে মনে হচ্ছিল কবি তখন প্রণয়িনীকে সে ভার বহনের দায়িত্ব দিয়ে এবং তাঁকে 'বিজয়িনী' রূপে জয়মালা পড়িয়ে দিয়ে প্রেমাশ্রুতে ভাসতে ভাসতে নিজে বিজয়ীর গৌরব অনুভব

করছিলেন। নজরুলের অন্যান্য প্রেমের কবিতা ও গান নিয়ে আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়। তবু অভিভাবকস্থানীয় বন্ধু মোহিতলালের সঙ্গে কাব্য-বিতর্কে নজরুল জানিয়ে দিয়েছিলেন যে শুধু প্রেমের বাঁশির সুর বা আর্ট নিয়ে মসগুল থাকলেই চলবে না, ক্ষুধার্ত মানবসন্তানদের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে কারণ 'প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,...'। 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাবধানী ঘণ্টা' থেকে এই পংক্তিটি উদ্ধৃত এবং সে কবিতারই শেষাংশে কবি ঘোষণা করেছেন ঃ

··মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত হয়ে রবে শাশ্বত।

'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহকর কবিতা প্রকাশে এক বছর কারা-যন্ত্রণা ভোগের পরেও নজরুল তাঁর রক্তঝরা লেখনীকে সংযত করার কোনো চেষ্টা করেন নি এবং এই মনোভাবের ফলে আবার রাজনিগ্রহ ভোগের উপক্রমও হয়েছিল বিদ্রোহী কবির। তাঁর বন্দী-জীবন দীর্ঘতর হতে চলেছিল। কারাদণ্ড নজরুলের বিদেশী অপশাসন-বিরোধী বিদ্রোহকে প্রশমিত করতে পারেনি। তিনি ক্রমাগত অগ্নিগর্ভ সব কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে চলেছিলেন। তিনি যেটা অনেকদিন আগেই বুঝেছিলেন অর্থাৎ ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে যেতেই হবে, সেই যাওয়াটাকে ত্বরান্বিত করার জন্যেই ছিল তাঁর এ ধরনের নিয়ত প্রচেষ্টা। তাঁর ও মুজাফ্ফর আহ্মদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম পর্যায়ের 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত তাঁর লেখা বাছাই প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলনের (১৯২২) মুখবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন, 'জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনও জাগ্রত জনসঙ্ঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়াছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ তাহা সাজিয়াছে; এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ, এখনও কি আর ও রকম ছেলেমানুষী চলিবে মনে কর?'

এই মনোভাব নিয়েই বন্দীদশা-মুক্ত হয়ে জেল থেকে বাইরে এলেন নজরুল আর তাঁর লেখনী অগ্নি-উদগীরণ করে চলতে লাগলো

দিকে দিকে। জেল থেকেও তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই শক্তিমান কবিকে উৎসাহিত করার জন্যে তাঁর প্রত্যেকটি প্রকাশিত কবিতা বাবদ দশ টাকা করে ধার্য দক্ষিণা পাঠিয়ে দিতেন। তখনকার দিনে এ ছিল মস্তবড়ো স্বীকৃতি।

১৯২৩ সালের মধ্য অক্টোবরে বহরমপুর জেল থেকে ছাড়া পাবার কিছুদিন পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে অংশ গ্রহণের আহ্বান পেলেন নজরুল। তিনি কয়েকদিন ছিলেন মেদিনীপুরে এবং সেখানে যেরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বর্ধনা ও অভিনন্দনাদি লাভ করেছিলেন ক'দিন ধরে তা' বিদ্রোহী কবি কোনো দিন ভুলতে পারেন নি। মুক্তি আন্দোলনে মেদিনীপুরের অতুলনীয় দানের কথা স্মরণ করে কবি পরবর্তীকালে তাঁর 'ভাঙার গান' বইখানি মেদিনীপুরবাসীদের উদ্দেশে উৎসর্গ করে তাঁদের সঙ্গে একাত্মতার সেতু রচনা করেন। তার কয়েক মাস পরেই গিরিবালা সেনগুপ্তের কন্যা প্রমীলার সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় কলকাতায়। সে উৎসবে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন হুগলীর লেখিকা মিসেস এম রহমান যাকে নজরুল বিরজাসুন্দরীর মতোই মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' উৎসর্গ করে সেই উৎসর্গ কবিতার উপসংহারে লিখেছিলেন :

শুধু মাতা নহ, জগন্মাতার আসনে বসেছ তুমি,—
সেই গৌরবে জননী আমার, তোমার চরণ চুমি।

'অগ্নিবীণা'র মতোই 'ভাঙার গান' ও 'বিষের বাঁশী' বিদ্রোহাত্মক ও দেশাত্মবোধক রচনার সমষ্টি। প্রকৃতপক্ষে 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় খণ্ড হিসাবে যে কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার কথা ছিল তা' 'বিষের বাঁশী' হিসাবে প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে কবি নিজেই গ্রন্থ-কৈফিয়তে লিখেছেন, 'নানা কারণে 'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদলে 'বিষের বাঁশী' নামকরণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আইন-রূপ আয়ান ঘোষ যতক্ষণ তার বাঁশ

উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত 'বিদ্রোহ' রাখার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশি লাগলে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেননা, বাঁশী হচ্চে সুরের, আর বাঁশ অসুরের।' এ লেখাটুকু থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগও কবি নজরুলকে বিদ্রোহের পথে চলায় নিরুদ্যম করতে পারে নি।

বাস্তবিকই পর পর কবি নজরুলের জীবন অতি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে যে তাঁর সংগ্রামে কোনো দিন ভাঁটা পরে নি, অবিরাম সংগ্রামই তাঁর জীবন। চল্লিশের দশকে হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত তাঁর বিদ্রোহী সত্তা মুহূর্তের জন্যেও স্তিমিত হয়নি।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালের বেশির ভাগ সময়ই কাটে নজরুলের হুগলীতে। হুগলীতে বসেই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে অনেক গান ও কবিতা লেখেন। সে সব গান ও কবিতা নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনায় গণকবি নজরুল যে আকাশের প্রচণ্ড ঝড়ো মেঘ দেখে রোগ শয্যায় বসেই সুদীর্ঘ আট পৃষ্ঠায় লেখা 'ঝড়' কবিতায় দেশের সর্বশ্রেণীর জনগণের উদ্দেশে বিপ্লবের ডাক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন,তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। জল বসন্ত ও প্রবল জ্বরে আক্রান্ত কবি তীব্র উত্তেজনায় বিপ্লবের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে লিখলেন 'ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ)' কবিতায়ঃ

ঝড় কোথা? কই?
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ—
ঐ শোন্ শোন তার হ্রেষার চিক্কুর
ঐ তার ক্ষুর হানা মেঘে।
না না আজ যাই আমি,
আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর
তুমি থাকো জেগে।

পশ্চিম থেকে ঝড় যখন পূবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই 'ঝড় (পূর্বতরঙ্গ)' বা পূবের হাওয়া নিয়ে এবং বর্ষণ শুরু হলে যথোপযোগী রকম রকম ছন্দে আরেকটি কবিতা রচনা করেন। 'ঝড়' কবিতা 'বিষের বাঁশী'তে শেষ কবিতা হিসাবে সে গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে।

হুগলী থেকে ক'দিনের জন্যে বিদ্রোহী কবিকে বাঁকুড়ায় যেতে হয়েছিল সেখানকার ছাত্র ও যুব সমাজের এবং গঙ্গাজলঘাটি জাতীয় বিদ্যালয় উদ্বোধনের আমন্ত্রণ পেয়ে। অমর নামের এক আদর্শবাদী স্বেচ্ছাসেবকের চেষ্টায় ঐ জাতীয় বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল বলে তার আরেকটি নাম ছিল 'অমর কানন'। এই 'অমর কানন'-এর ছাত্রদের জন্যে কবি ভারি সুন্দর একটি গান লিখে দিয়েছিলেন যেটি 'ছায়ানট' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গানটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

অমর কানন

(মোদের) অমর কানন !
বন কে বলেরে ভাই, আমাদের তপোবন।
আমাদের তপোবন।
(এর) দক্ষিণে শালীনদী কুলু কুলু বয়,
(তোর) কুলে কুলে শালবীথি ফুলে ফুলময়,
... ...
মোরা বটের ছায়ায় বসি করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষীদের মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাঠ,
ঘরে ঘরে ভাই বোন বন্ধু স্বজন।

বিদ্রোহী কবির বাঁকুড়া সফরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই, বাঁকুড়ার ছাত্র ও যুব সমাজের যে মিছিলটি এসেছিল বাঁকুড়া স্টেশনে কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে তার পুরোভাগে ছিলেন বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী। ব্রাউন সাহেবের হাতে এক কপি 'বিষের বাঁশী' এবং মিসেস ব্রাউনের হাতে একখানি 'ভাঙার গান' শোভা পাচ্ছিল—তা দেখে নজরুল বিস্মিত না হয়ে

পারেন নি এই ভেবে যে বোমা-রিভলবারের চেয়েও যে সব বইকে সাহেবরা বেশি ভয়ের কারণ বলে মনে করে তেমনি ছ'খানি ভয়ঙ্কর বই এই ইংরেজ দম্পতীর হাতে! কবিকে এরূপ বিস্ময়ান্বিত দেখে ব্রাউন-দম্পতী নজরুলকে জানালেন, তিনি বাংলা কাব্যে এমনি পৌরুষের আমাদানী করেছেন যে, তাঁর রচিত এসব গ্রন্থ পড়ে তাঁরা সব সময় খুব তৃপ্তি লাভ করেন। কবি রেলওয়ের বিশ্রামাগারে ব্রাউনদের সঙ্গে বসে যখন জলযোগ করছিলেন সে সময়ে বাইরের স্বেচ্ছাসেবকের দল আবৃত্তি করছিল:

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল ভাই।

ঘরের ভেতর থেকে তা শুনতে পেয়ে যে ভাবে ছুটে এসে স্বেচ্ছা-সৈনিকদের সঙ্গে আবৃত্তিতে কবি যোগ দিয়েছিলেন তাতে ছেলেরা এবং তাদের অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ-পত্নীকে অবাক হতে হয়েছিল। কবি স্টেশন থেকে সাহেবের গাড়িতে না গিয়ে মাইল দুই পথ ছেলেদের সঙ্গে হেঁটেই শহরের ছাত্রাবাসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। এর ফলে বাঁকুড়ার যুবসমাজ অতি সহজেই কাজী নজরুলের খুবই আপন হয়ে উঠেছিল। এই সব ভক্ত যুবকরাই ছাত্র যুব সম্মেলনের দিন প্রায় আটশ কপি 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' বই বিক্রি করেছিল। এসব ঘটনার জন্যে বিদ্রোহী কবির সেবারের স্বল্পকালীন বাঁকুড়া সফর তাঁর কাছে খুব স্মরণীয় হয়েছিল। সম্মেলন শেষে কবি গিয়েছিলেন বিষ্ণুপুর দর্শনে। বিষ্ণুপুরের একদার স্বাধীন রাজাদের নানা কীর্তিকলাপ দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং প্রাচীন বিরাট দলমাদল কামানটিকে আনন্দের আতিশয্যে, স্বাধীনতার প্রতীকরূপে আলিঙ্গন করে ধন্য বোধ করেছিলেন হাবিলদার কবি।

এর পর থেকেই ক্রমে ক্রমে কবির হুগলী বাসের আনন্দ কমে আসতে থাকে এবং অনাদার ও উপেক্ষার মাত্রা বাড়তে থাকায় দারিদ্র্যের চাপও সে অনুপাতে বেড়েই চলে। নজরুল তাতেও দমবার নন। সেই আর্থিক দুঃস্থতার দিনেই কবি কৃষ্ণনগরের কংগ্রেস

নেতা হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতির রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র হিসাবে কলকাতা থেকে ১৯২৫ সালের শেষ সপ্তাহে 'লাঙল' সাপ্তাহিকটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে মাস চার জীবিত ছিল। ১৯২৫-এর শেষ দিকে হেমন্তবাবু তাঁর বন্ধুদের নিয়ে প্রায়ই হুগলীতে নজরুলের কাছে যাতায়াত করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত নতুন বছরের শুরুতেই সপত্নীক বিদ্রোহী কবিকে কৃষ্ণনগর নিয়ে আসেন। কৃষ্ণনগরে সে বছরেই সেপ্টেম্বরে কবির দ্বিতীয় পুত্র অরিন্দম খালেদের (বুলবুল) জন্ম এবং মাত্র চার বছর বয়সে কলকাতায় আসার পর সেই স্মৃতি-শক্তিধর বালকটির জীবনাবসান ঘটায় নজরুলের মতো শক্ত মানুষও মুষড়ে পড়েছিলেন। সন্তান বিচ্ছেদে কাতর পিতা তাঁর প্রিয় বুলবুলকে নিয়ে একটি কবিতাও রচনা করেছিলেন এবং 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এর বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানি বুলবুল-এর নামেই উৎসর্গ করেছিলেন।

কৃষ্ণনগর যাবার তিন মাসের মধ্যেই কলকাতায় রাজরাজেশ্বরীর মিছিল নিয়ে যে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয় তার বিস্তৃতিতে কবি অত্যন্ত বেদনার্ত হয়ে পড়েন। জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্যে যিনি অবিরাম চেষ্টা করে চলে ছিলেন এমন ঘটনায় তিনি যে গভীরভাবে মর্মাহত হবেন সে তো জানা কথাই। সাম্প্রদায়িকতাই জাতির সমস্ত দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের সব চেয়ে বড়ো কারণ, জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা বড়ো অভিশাপ বলে নজরুল মনে করতেন। সে জন্যেই ব্যক্তিজীবনে তিনি সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িকতার পথ অনুসরণ করে চলেছেন। হিন্দু-কন্যা বিবাহে এবং চারটি পুত্রের নামকরণে (কৃষ্ণ মহম্মদ, অরিন্দম খালেদ, কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ) তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ধর্ম-সমন্বয়বাদী নজরুল হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার সংবাদে তো বিচলিত হয়ে উঠবেনই।

সে সময়টাতেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এ উপলক্ষ্যে পরপর আরো দু'টি সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়—একটি ছাত্র-যুব সম্মেলন এবং অপরটি কৃষক সম্মেলন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যথাক্রমে এ দু'টি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনটি সম্মেলনেরই উদ্বোধন করেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম তাঁর স্বরচিত গান দিয়ে। মূল রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের মূল অধিবেশন বসেছিল কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বিরাট পূজা প্রাঙ্গণে এবং অন্য দুটি সম্মেলনের স্থান ঠিক করা হয়েছিল টাউন হলে। রাষ্ট্রীয় সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য আগের দিন রাত্রিতে কবি দাঙ্গা পরিস্থিতিতে বেদনাহত অন্তরে এমন একটি গান রচনা করলেন জাতীয় মুক্তি সঙ্গীত হিসাবে যাকে অতুলনীয় বলা চলে। সম্মেলন উদ্বোধনে পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে কবি নজরুল তাঁর কম্বুকণ্ঠে জনগণমন অধিনায়ক কাণ্ডারীকে আহ্বান জানিয়ে গাইতে শুরু করলেন ঃ

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত,
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

এবারের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন রাজবন্দী কিন্তু কয়েক বছর পর ১৯২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতা এলবার্ট হলে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে কাজী নজরুল ইসলামকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় সমগ্র বঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে সে অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের এক স্থানে দুর্গম গিরি গানটির উল্লেখ করে বলেন, 'আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না!' কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয় সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।'

বাস্তবিক পক্ষে কৃষ্ণনগর সম্মেলনে গাওয়া নজরুলের এই অতুলনীয় গানটি সেই থেকে অহরহই গীত হয়ে আসছে। তার পরে টাউন হলে ছাত্র-যুব সম্মেলনে যে গানটি নজরুল গেয়েছিলেন সেটিও চিরকালের জন্যে জনপ্রিয় হয়ে আছে। সে অনুষ্ঠানে কবি গাইলেন ঃ

আমরা শক্তি আমরা বল,
আমরা ছাত্র দল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্র দল ॥
মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়!
... ...
(আমরা) তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল ॥

'ছাত্রদলের গান' নামে অভিহিত এই গানটি সেকালে বাঙলার ছাত্র সমাজকে যে কিরূপ উদ্দীপ্ত করতো তা' আজ বোধহয় ধারণাতীত। এরপর কৃষ্ণনগর টাউন হলেই কৃষক সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্বোধন সঙ্গীত কবি গাইলেন চির-উপেক্ষিত দরিদ্র কৃষক সমাজকে জেগে ওঠবার আহ্বান জানিয়ে ঃ

আজ জাগরে কৃষাণ, সবতো গেছে কিসের বা আর ভয়
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।

এই 'কৃষাণের গান'টি কবি হুগলী থাকতেই 'লাঙল' সাপ্তাহিকের জন্যে লিখেছিলেন। কৃষ্ণনগরে চলে আসার পর সেখানে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে গানটি কাজে লেগে গেল।

কৃষক জাগরণের জন্যে আরো অনেক কবিতা ও গান লিখেছেন নজরুল। 'ওঠ্ রে চাষী' কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

জাগেনা কি শুকনো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর ?
চোখ বুজে তুই দেখবি রে আর, করবে চুরি চোর ?
হাত তুলে তুই চা দেখি ভাই, অমনি পাবি বল,
তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদার কল !

শ্রমিক জাগরণকেও নিশ্চিত করে তোলবার জন্যে নজরুল যে চিত্ত-উদ্দীপক 'শ্রমিকের গান'টি রচনা করেছিলেন এই পটভূমিকায় তার উল্লেখ করা চলে। সে গানে কবি লিখেছেন ঃ

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল
ধর হাতুড়ি তোল্ কাঁধে শাবল
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙবো চল্ !
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দলমাদল !
ধর হাতুড়ি তোল্ কাঁধে শাবল ॥

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজাদের বিরাট 'দলমাদল' কামান দর্শনের স্মৃতি নজরুলের এই 'শ্রমিকের গান'টিতে স্থান পেয়েছে। চাষী ও শ্রমশক্তি নিয়ে অনেক কবিতা ও গান রয়েছে বিদ্রোহী কবির। এমন কি জেলেদেরও আত্মসচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই খুব জোরের সঙ্গেই তাঁর রচিত 'ধীবরের গান'-এ বলা হয়েছে ঃ

আমরা নীচে প'ড়ে রইব না আর
শোন্‌রে ও ভাই জেলে
এবার উঠ্‌ব রে সব ঠেলে !

এমনি সব চাষী-মজুর-জেলে শ্রেণীর সাধারণ মানুষকে নজরুল তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন বলেই মনীষী ও জননায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মানিকগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে বলেছিলেন, 'এঁর (নজরুলের) কবিতার

সাথে পরিচিত হয়ে দেখলাম,—এ তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি থেকে উঠে এসেছে। আগেকার কবি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দোতলা প্রাসাদে থেকে কবিতা লিখতেন······নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মেছেন জানিনা; কিন্তু তাঁর কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশে যে নূতন ভাব জন্মেছে তার সুর তাও-ই। তাতে পালিশ বেশী নেই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান। মানুষের একাত্ম সাধন। এ অতি অল্প লোকেই করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি।···শরৎ বাবু ও নজরুল ইসলাম ছাড়া গত দশ বছরের মধ্যে কোন ভাবুক লেখকের উদয় হয় নি।···জাতির প্রাণে লাঙল এসেছে, নূতন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝংকারে তা পাই।'

নজরুল কাব্যে গ্রাম্যতা দোষের অভিযোগ কেউ কেউ করেন। বিপিনচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্যে এই অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। শতকরা আশি ভাগ লোক যেখানে গ্রামের মানুষ সে দেশের সাহিত্যে গ্রাম্যতা একটু বেশি থাকলে ক্ষতি নেই, শহুরে দোষে বেশি দুষ্ট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লোভী শোষকেরা ও মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টিকারীদের দমন করে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আবার সুন্দর করে তোলবার আকাঙ্খায় নজরুল ছাড়া আর কে লিখতে পারে:

মহামানবের মহা-বেদনার আজি মহা উত্থান,
ঊর্দ্ধে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান

নারী-শক্তিকে জাগাবার জন্যেও কবি তাঁদের ডাক দিয়ে বলছেন:

'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা'
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা॥

এমনিভাবে চতুর্দিকে জাগরণ-মন্ত্র ছড়িয়ে দিলে কি হবে? জাতীয় অগ্রগতি ও মুক্তির পথে যে সবচেয়ে বড়ো বাধা তাকে দূর করতে না পারায় কবি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও কবি জানতেন ইংরেজের শয়তানীতে কলহমত্ত দেশবাসীর ভুল ভাঙবেই। এবং ভ্রাতৃবিরোধের যে আগুন ইংরেজ লাগিয়ে দিয়েছে সে আগুনেই তার ভারত সাম্রাজ্যের

ঢাকায় প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ম্যাণ্ডোলিনটিসহ শয্যাশায়ী কবি নজরুল ইসলাম।

স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে বলে কবি নজরুলের মনে একটা গভীর আশাও জেগেছিল। তাইতো সেই দাঙ্গার সময়ে কঠোর ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় লেখা তাঁর 'হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় দেখি হতাশার পাশা-পাশি একটা আশাও ভারি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। দীর্ঘ কবিতাটির আরম্ভ ও শেষ থেকে দু'টি উদ্ধৃতি দিয়েই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝানো যাবে। কবি লিখেছেন :

মাভৈঃ! মাভৈঃ এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ।
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান!
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জুন ছোড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান।
... ...
যে-লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দূর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে ত তবু—বিজয়-কেতন উড়া।
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবিধানকে নজরুল প্রকৃতপক্ষে সাধনা হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯২০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তাঁর প্রকৃত সাহিত্য জীবনে কত কবিতা, গান ও প্রবন্ধই না তিনি রচনা করেছেন। এ বিষয়ে নজরুল রচিত দু'টি গান সত্যি অনবদ্য। একটি গানে কবি বলছেন :

হিন্দু মুসলমান দুটী ভাই,
ভারতের দুই আঁখি তারা।
এক বাগানে দুটী তরু
দেবদারু আর কদম চারা॥

অত্যন্ত জনপ্রিয় আরেকটি গানে নজরুল লিখেছেন :

মোরা একবৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মোসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি হিন্দু তাহার প্রাণ॥

'ভগবানের ফৌজদারী কোর্ট নাই সেখানে জাত বিচার' এবং 'জাত সে শিকেয় তোলা রবে, কর্ম নিয়ে বিচার হবে'—এত সব বলা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদের পাপ থেকে দেশ রক্ষা পেল না, এজন্যে বিদ্রোহী কবির মর্মবেদনার শেষ ছিল না।

যাই হোক এ নিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই! তবে নজরুল এ সম্পর্কে অত্যন্ত কড়া ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। 'রুদ্রমঙ্গল' প্রবন্ধ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ লেখাটি ১৯২৬-এর ২৬ আগস্ট তারিখের 'গণবাণী' ('লাঙল'-এর স্থলবর্তী) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর প্যাক্ট এবং তার ব্যর্থতা নিয়ে তিনি কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করেছিলেন কিন্তু এখানে সে সবের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে রক্ষা করার জন্যে কংগ্রেস নেতা হেমন্ত সরকার কবি নজরুলকে সপরিবারে কৃষ্ণনগরে নিজের বাড়িতে এনে প্রথমে উঠিয়েছিলেন এবং তার সুফলও তিনি লাভ করেছিলেন। এর অল্পকাল পরে আইন সভার নির্বাচনে অধিকাংশ মুসলমানের ভোটে তিনি নির্বাচিত হন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি পরিবারকে সেই দারিদ্র্যের কষাঘাতেই জর্জরিত হতে হয়েছে। হেমন্ত সরকারের বাড়ির সাহায্যেও তাঁর অভাব ঘোচেনি, বার বার তিনি তাঁর প্রকাশকদের কাছে এবং বন্ধুদের কাছে কুড়ি-পঁচিশটি টাকা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্বীকৃত 'দারিদ্র্য' কবিতাটি সে সময়েরই রচনা। 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!' বলে আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত কবিকে শেষ স্তবকে বলতে হয়েছে :

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !

শুধু এই নয়, স্ত্রী-পুত্রের বেদনা-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কবিকে আরো লিখতে হয়েছে অসহ্য দারিদ্র্যের মর্মজ্বালায় ঃ

পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে ! মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশি ?

বাস্তবিকই এ অবস্থায় কি বাঁশি বাজানো যায় ? সত্যি ব্যাপারটা খুবই শক্ত। তবু সৃষ্টি-পাগল নজরুলের পক্ষে তাও সম্ভব হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের চরম দারিদ্র্যের পরিবেশ থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছেন, ঢাকায় গিয়েছেন—সে সব জায়গায় গিয়ে তিনি 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মেতে উঠেছেন। ১৯২৬ এবং ১৯২৯-এর চট্টলা সফরের সুফল তাঁর 'সিন্ধু হিল্লোল' ও 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ গান ও কবিতা। ঢাকায়ও নজরুল ক'বার গিয়েছেন। ১৯২৭ এবং ১৯২৮-এ দু বছরই তাঁকে ঢাকায় যেতে হয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করতে। ঢাকায় গিয়ে তিনি নতুন প্রকাশিত 'নওরোজ' নামক একখানি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পুলিশী হুজ্জুতির ফলে এই সাহিত্য পত্রিকাখানি কিছুকালের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৮ সালের ঢাকা সফর কালেই নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'চল্ চল্ চল্' কোরাস গানটি রচনা করেন যেখানে 'অরুণ প্রাতের তরুণ দলে'র অগ্রগতিকে ঘোষণা করে বলা হয়েছে ঃ

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

নবজীবনের গাহিয়া গান
সঞ্জীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

কিন্তু ১৯২৮-এর এই কঠিন সঙ্কল্প রূপায়িত হয়ে উঠছেনা দেখে নজরুল পরাধীনতার জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'সন্ধ্যা' নামক কাব্যগ্রন্থে স্বাধীনতাসূর্যহীন ভারত-সন্ধ্যার ওপর লিখলেন ঃ

সন্ধ্যা কি কাটিবে না!
কত সে জনম ধরিয়া শুধিব এক জনমের দেনা?
কোটি কর ভ'বি কোটি বাঙা হৃদি জবা লয়ে করি পূজা,
না দিস আশিস, চণ্ডীর বেশে নেমে আয় দশভূজা!
মোদের পাপের নাহি যদি ক্ষয় যদি না প্রভাত হয়,
প্রলয়ঙ্করী বেশে আসি কর ভীরুব ভারত লয়!

পরাধীনতার অন্ধকার থেকে মুক্তির সম্ভাবনা যদি নাই থাকে তা হলে প্রলয়ঙ্করী বেশে এসে চণ্ডী এই ভীরুর ভারতকে ধ্বংস করে দিক, অধৈর্য কবি এই প্রার্থনাই জানিয়েছিলেন মা দশভূজার কাছে। এমনি সব অগ্নিশ্রাবী কবিতা একের পর এক নজরুল লিখে চলেছিলেন সেই চরম দারিদ্র্যের দিনগুলিতেও এবং কিছু অপ্রকাশিত রাজদ্রোহ মূলক কবিতা এবং এক বছরের নতুন কবিতা নিয়ে ১৯৩০ সালের শেষ দিকে 'প্রলয় শিখা' নামে কবির আরেকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রলয়ের সুরই ধ্বনিত এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতায়। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যে যুবশক্তির প্রলয়-নাচন চলছে, তার কথাই কবি বলছেন ঃ

মুক্তি দানিতে এসেছি আমরা দেব-অভিশাপ
দৈত্যত্রাস,
দশদিক জুড়ি জ্বলিয়া উঠেছে প্রলয়বহ্নি
সর্বনাশ!

উর্ধ্ব হইতে এসেছি আমরা প্রলয়ের শিখা
অনির্বাণ
জতুগৃহদাহ অন্তে করিব জ্যোতির স্বর্গে
মহাপ্রয়াণ।

ইংরেজ সরকারেব অত্যাচারের প্রতিবাদে কারাগারে ৬৪ দিন অনশনে থেকে আত্মদানেব এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন শহীদ যতীন দাস। সেই ঘটনাকে তুলে ধবে বিদ্রোহী কবি দেশের যুবশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশে 'যতীন দাস' কবিতায় লিখলেন ঃ

মহিষ-অসুর-মর্দিনী মা গো,
জাগ্ এইবার খড়্গ ধর।
দিয়াছি যতীনে অঞ্জলি—
নব ভারতের আঁখি ইন্দীবর।

এ কবিতাটিও 'প্রলয় শিখা'র অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকাব এই সঙ্কলনটি বাজেয়াপ্ত কবে। তবে সরকারী আদেশ জারির আগেই অনেক বই বাজারে ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বইখানা শুধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই সরকাব ক্ষান্ত হননি, এ বইয়েব জন্যে কবি নজরুলকে রাজদ্বারেও দ্বিতীয় বার রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল এবং আবার তাঁর কারাবাসের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় বার ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হলে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহী কবি নজরুলকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কবেছিলেন। কিন্তু এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হলেও ১৯৩১ সালের গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলে কবিকেও বেকসুর অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এই অব্যাহতির পর দ্বিতীয় বার আর নজরুলকে 'বন্দী কবি' হতে হয়নি বটে তাহলেও বিদ্রোহী কবির গোটা জীবনই ছিল প্রকৃত পক্ষে বন্দী কবির জীবন। কারণ কবি মনে করতেন, গোটা পরাধীন ভারতই একটা বিরাট বন্দীশালা এবং প্রত্যেক ভারতবাসীই সেই বন্দীশালার বন্দী। ভারতের সাতকোটি মুসলমান যদি ইংরেজের ক্রীড়নক না হয়ে

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরোপুরি সামিল হতো তা' হলে শৃঙ্খলিত ভারত-কারাগারে আর আমাদের অপমানের জীবন যাপন করতে হতো না, এই কথাটি কবি গভীর বেদনার সঙ্গে একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন :

কশাইখানার সাতকোটি মেষ
ইহাদের শুধু নাহি কি ত্রাণ ?
মার খেয়ে খেয়ে মরিয়া হইয়া
উঠিতে এদের নাই কি প্রাণ ?
জেগেছে আরব ইরাণ তুরাণ
মরক্কো আফগান মেসের
এয় খোদা ! এই জাগরণ রোলে
এ মেষের দেশও জাগাও ফের।

মৌলানা-মৌলভীদের হাত করে ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে সফল হয়েছে বটে কিন্তু আমাদের কবি নজরুল দেখিয়েছেন তাঁর 'আমানুল্লা' কবিতায় :

তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদার-ই-হিন্দ নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙনি, ভাঙনি একখানি ইট মন্দিরের।

গোলাম কখনো মুসলমান হতে পারেনা, একথাও কবি শুনিয়েছেন দেশের সমস্ত মুসলমান ভাইদের। তাঁর মুসলমান পাঠকদের মধ্যে বহু পঠিত 'খালেদ' কবিতায় সে কথাটাই কবি সকলের মর্ম বিদ্ধ করে লিখেছেন :

মুসলমান খুন দেখিয়াছে, তুন বহিয়াছে,
নুন বহেনিক কভু।

তাই তো বড়ো আশায় তিনি লিখলেন তাঁর 'মিলনের গানে' কবিতায় :

ভাই হয়ে ভাই চিন্‌বি আবার ! গাইব কি আর এমন গান !
(সেদিন) দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার, মরা গাঙে ডাকবে বান॥

'দাস মহলের খাস গোলাম' হিন্দু-মুসলমানকে কবি এই 'মিলন

গানে' কবিতায় অতি দুঃখে 'মাতৃহন্তা কুসন্তান' বলে তিরস্কার করেছেন কারণ '(মা'র) বন্ধ ঘরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল দুই নয়ান্!' অথচ সে দিকে কারো লক্ষ্য নেই। কত গভীর যন্ত্রণা থেকে যে স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী কবি বলেছেন, '(তোরা) বাঁদর ডেকে মানলি সালিস, ভাইকে দিতে ফাটল প্রাণ', তা' এখন বোধহয় সকলেই বুঝতে পারছে যে বানরের পিঠে ভাগের মতো ইংরেজের সালিশীতে কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদেরই কত দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও দেশ-বিভাগের কথায় নজরুল যে কিরূপ বেদনার্ত বোধ করতেন তা আমরা জানি। তবে কঠিন ব্যাধিতে বোধলোপের ফলে নির্বাক কবিকে বঙ্গ-জননী তথা ভারত-জননীর দ্বিখণ্ডী করণের অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করতে হয়নি। নিষ্ফল আশায় তিনি তখন স্তব্ধ সমাহিত।

বিদ্রোহী কবির মোটামুটি এই জীবনচিত্র। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে এই বিদ্রোহী কবির মধ্যে সব সময়ই যেমন একজন গীতিকার ও গায়ক কবি লুকিয়েছিলেন তেমনি ছিল একজন চিরকালের শিশু বা বালক কবি লুকিয়ে। সেই শিশু বা বালক কবির কথা গ্রন্থারম্ভেই অনেকটা বলা হয়েছে যখন কাজী নজরুল ছিলেন সত্যি সত্যি বালক কবি। কিন্তু বড়ো হয়েও এবং গরম গরম সংগ্রামী কবিতা লিখতে লিখতেই শিশু মনের খেয়াল চরিতার্থ করতে পারে বা শিশু-কিশোর-দের শিক্ষণীয় এবং তাদের হাসির খোরাক জোগাতে পারে তেমন বেশ কিছু ছড়ার গান ও কবিতা রচনা করেছেন নজরুল, যেগুলি তাঁর 'ঝিঙে ফুল', 'সাত ভাই চম্পা' কবিতা সংকলনে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া তাঁর 'পুতুলের বিয়ে' নাটকে এবং 'শেষ সওগাত' ও 'সঞ্চয়ন'—এও ছোটদের জন্যে তাঁর রচিত বেশ ভালো ভালো কয়েকটি কবিতা রয়েছে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ বোধহয়, নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে 'ঝিঙে ফুল'-এর 'প্রভাতী' কবিতাটি যতকাল বাংলা শিশু সাহিত্য থাকবে ততকালই সগৌরবে বেঁচে থাকবে। এ কবিতায় প্রভাতের অপরূপ বর্ণনার সঙ্গে রবিমামার রাঙা জামা ও দারোয়ানের

'রামা হৈ' গানের ছন্দ-মিল শিশু মনকে এমনভাবে নাচিয়ে-দুলিয়ে তোলে যে তার তুলনা মেলাই ভার। ভোর হয়েছে তাই খুকুমণিকে ডেকে বলা হচ্ছে ঃ

ভোর হোলো দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে'
ঐ ডাকে জুঁই-শাখে
ফুল খুকী ছোট রে!
রবি মামা দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান গায় গান
শোনো ঐ, 'রামা হৈ'!

এই বলে খুকুমণিকে জাগিয়ে তুললেই তো হবে না, ঘুম থেকে উঠে তাকে কি করতে হবে সেটাও তো তাকে বলে দেওয়া দরকার। এ কবিতার শেষটায় কবি সে সব কর্তব্যও খুকুকে বলে দিয়েছেন ঃ

নাই রাত মুখ হাত
ধোও, খুকু জাগো রে!
জয় গানে ভগবান
তুষি' বর মাগো রে!

শিশুদের জন্যে এটি একটি অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষণীয় কবিতা। এসব ছাড়া বেশ কয়েকটি মজার মজার কবিতাও নজরুল লিখেছেন ছোটদের আনন্দ দেবার জন্যে। 'খুকী ও কাঠ্‌বেড়ালি' কবিতাটি যখন কোনো বাচ্চা আবৃত্তি করে তা শুনে না হেসে পারে কেউ? 'খুকী ও কাঠ্‌-বেড়ালি' আবৃত্তি করছে একটি শিশু ঃ

কাঠ্‌বেড়ালি! কাঠ্‌বেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি লেবু? লাউ?
বেড়াল বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?—
ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক

বাতাবি লেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো !

কী কমৎকার ! তাই না ? কাঠ্‌বেড়ালির সঙ্গে খুকীর কী মজার কথাবার্তা !

দাদু:দের নিয়ে সব শিশুই রঙ্গ-রসের হাট বসিয়ে থাকে। ছোটদের তেমনি এক রসের হাট বসাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে 'খাঁদু-দাদু' নামে একটি ছড়া রচনা করেছেন নজরুল যা যথার্থই একটি হাসির কবিতা। একটি শিশু তার মাকে বলছে মায়ের বাবা সম্বন্ধে :

দাদু বুঝি চীনা ম্যান্ মা, নাম বুঝি চাং চু ?
তাই বুঝি ওর মুখ্‌টা অমন চ্যাপটা শুধাংশু !
জাপান দেশের নোটিস উনি নাকে এঁটেছেন।
অ-মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং !
দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপ্টা নাকেই বাজ্‌তো সাতটা শাঁখ,
দিদিমা তাই থ্যাব্‌ড়া মেরে ধ্যাব্‌ড়া করেছেন !
অ-মা ! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং ড্যাং ? ইত্যাদি।

এ কবিতা পড়ে না হেসে পারা যায় কখনো ? নজরুলের আর একটি নাচানো ছন্দের হাসির কবিতা হলো 'ঝিঙে ফুল'-এর অন্তর্ভুক্ত 'লিচু চোর' যেখানে বলা হচ্ছে :

বাবুদের তালপুকুরে হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ করলে তাড়া বলি থাম, একটু দাঁড়া !
পুকুরের ঐ কাছে না লিচুর এক গাছ আছে না,
হোতা না আস্তে গিয়ে অ্যাব্বর এক কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে যেই চড়েছি ছোট এক ডাল ধরেছি,
ও বাবা মড়াৎ ক'রে পড়েছি সরাৎ জোরে।
পড়্‌বি পড়্ মালীর ঘাড়েই সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটাভাই বড় নচ্ছার ধুমাধুম গোটা দুচ্চার,
দিলে খুব কিল্ ও ঘুষি একদম জোর্‌সে ঠুসি !

শুধু কি এই, ছোটদের কাছে বিয়েবাড়ির মজা হলো সেরা মজা সে মজা রোজই যদি উপভোগের সুযোগ পাওয়া যেতো তা হলে সো কতই না সুখের হতো! মামার বিয়েতে সে আনন্দেরই প্রকাশ ঘ শিশু যখন বলে ঃ

কি যে ছাই ধানাই পানাই—
সারাদিন বাজছে শানাই,
এ দিকে কারুর গা নাই
আজি না মামার বিয়ে!
বিবাহ। বাস্ কি মজা!
সারাদিন মণ্ডা গজা
গপাগপ খাওনা সোজা
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে॥

মামার বিয়েতে খুশীর অন্ত নেই ভাগ্নের। সেই আনন্দে আধিক্যে এমনই মেতে উঠেছে শিশু-ভাগ্নে যে নিজের বিয়ের একটি ইচ্ছে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে তার মধ্যে। সে কথাই সে বলছে শেষ পর্যন্ত ঃ

মামীমা আসলে এ ঘর
মোদেরও করবে আদর?
বাস কি মজার খবর!
আমি রোজ করব বিয়ে॥

বিদ্রোহী কবি রচিত আরো কিছু হাস্যরসের মজার মজার শিশু-কবিতা রয়েছে যার খানিক খানিক অংশ উদ্ধৃত করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সে অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু 'খোকার গপ্প বলা' 'ঘুমপাড়ানী গান' এবং 'মা' কবিতা অংশত তুলে দেওয়া হচ্ছে শিশু মনোরঞ্জনে নজরুলের গভীর আগ্রহ সপ্রমাণ করার জন্যে। 'খোকার গপ্প বলা' কবিতার রূপকথাটি শুনে খোকা-খুকু মহলে হাসির হুল্লোড় পড়ে যাবেই। রূপকথাটি এই ঃ

একদিন না রাজা—
ফড়িং শিকার করতে গেলেন খেয়ে পাঁপড় ভাজা
রাণী গেলেন তুলতে কলমী শাক্
বাজিয়ে বগল টাকডুমাডুম টাক।
রাজা মশাই ফিরে এলেন ঘুরে
হাতীর মতন একটা বেড়াল বাচ্চা শিকার করে।

নজরুলের লেখা 'ঘুমপাড়ানী' গানটি সত্যিকারের একটি চিরকালীন গান রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় এ ছড়া-গানের তুলনা নেই, যে গান বাঙলার ঘরে ঘরে শোনা যায়ঃ

ঘুমপাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো
ঘুম আয়রে, ঘুম আয় ঘুম।

কিন্তু শিশুদের কাছে সব কথার শেষ কথা 'মা'। তাই নজরুলের 'মা' কবিতায় শিশু যখন বলেঃ

যেখানেতে দেখি যাহা
মা-এর মতন আহা
একটি কথায় এত সুধা মেশা নাই,
মায়ের মতন এত
আদর সোহাগ সেতো
আর কোনখানে কেহ পাইবে না ভাই।

তখন প্রাণ ভরে ওঠে এবং সত্যি সত্যি তখন সবারই যেন আবৃত্তি করে বলতে ইচ্ছে হয়ঃ

আয় তবে ভাই বোন,
আয় সবে আয় শোন্
গাই গান পদধূলি শিরে লয়ে মা'র,
মা'র বড় কেউ নাই—
কেউ নাই কেউ নাই।
ন'তি করি' বল্ সবে 'মা আমার! মা আমার!'

যে মাতৃভক্ত কবি সত্যি সত্যি 'মা'র বড় কেউ নেই' বলে মনে করতেন তিনি মাতৃহারা হলেন ১৯২৮ সালে, বাংলা ১৩৩৫-এর ১৫ জৈষ্ঠ তারিখে। তিনি সে সময়ে ছিলেন কৃষ্ণনগরে সপরিবারে। মাত্র ৮ বছর বয়েসে যে শিশু পিতৃহারা হয়ে স্বগ্রামে কঠোর সংগ্রাম শুরু করেছিলেন মা ও ভাই বোনদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, সেই নজরুল তাঁর স্নেহময়ী জননীকেও হারালেন তার ২০ বছর পর দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে করতে। পরের বছরের গোড়ার দিকেই কাজী নজরুল ইসলাম সপরিবারে চলে এলেন কলকাতায়। তখন তাঁর বয়েস ২৮ পেরিয়ে ২৯ বছর।

গীতি কবি

কলকাতায় এসে প্রথমে কবি ওঠেন ওয়েলিংটন স্ট্রীটে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকা আফিসের নিচের তলার দু'খানা ঘরে। কিছুকাল পরে সে বাসা ছেড়ে চলে যান ইন্টালি এলাকার পানবাগান লেনে যেখানে মাত্র চার বছর বয়েসের প্রিয় পুত্র বুলবুলের বসন্ত রোগে মৃত্যুতে নজরুল একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়েই তিনি স্বনামধন্য গৃহীযোগী বরদাকান্ত মজুমদারের আশ্রয়ে এসে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন। এবং তখন থেকে ক্রমে ক্রমে তিনি কবিতার রাজ্য থেকে সঙ্গীত সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে প্রকৃত পক্ষে গানেই বিশেষ-ভাবে আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন।

সে কথা নিজেই বলেছেন নজরুল ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে। সেটা ১৯৩৬ সালের কথা। সেই ভাষণে কবি বলেছিলেন, 'আমি বর্তমানে সাহিত্যের সেবা থেকে, কলমের খিদমৎগারী থেকে অবসর গ্রহণ করে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগর দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছি।' সত্যি সত্যি সে সময়ে কবি প্রধানত সঙ্গীত রচনায়ই ব্যস্ত থাকতেন আর দেশী-বিদেশী নানা রাগ-রাগিনী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন এবং তার চর্চা করতেন।

ছোটবেলা থেকেই গান রচনা ও গান গাওয়ার দিকে নজরুলের যে প্রচণ্ড ঝোঁক লক্ষ্য করা গেছে সেই লেটোর গানের যুগে, সে ঝোঁক তাঁর শুধু অব্যাহতই থাকেনি সে দিকে তিনি আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়েছেন বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত 'সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগর দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ' করেন। 'বালক কবি', 'বিদ্রোহী কবি' ও 'বন্দী কবি' পূর্ববর্তী এই তিনটি অধ্যায়েই নজরুল-বিষয়ে এসবের উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু কিছু গান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও করা হয়েছে। অধিকাংশই অবশ্য দেশাত্মবোধক ও বিদ্রোহাত্মক গান এবং কিছু কিছু ছোটদের উপযোগী ছড়া জাতীয় গান। এর অবশ্য কারণও আছে। আন্তর্জাতিক শিশু-কিশোর বর্ষে দেশের শিশু ও কিশোরদের

কাজী নজরুল ইসলামের নিখাদ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার মূল লক্ষ্য সামনে রেখেই এই গ্রন্থের প্রকাশনা।

তবুও নজরুলকে মোটামুটিভাবে জানতে হলে গীতিকার ও সুরকার হিসাবে তিনি যে সারা ভারতে এক অবিস্মরণীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন সেটুকু না জানলে তাঁকে অসম্পূর্ণ জানা হয়। প্রায় তিন হাজারের মতো সঙ্গীতের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম এবং এতগুলি গানের সুরকারও তিনিই। এমন রেকর্ড সারা পৃথিবীতে বোধ হয় কোথাও নেই। শক্তিমান সাহিত্য-সঙ্গীত সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কাজী নজরুলের গান' বইতে যথার্থই বলেছেন, 'নজরুল সত্তায় যেন এক অফুরন্ত সৃষ্টির সঞ্চয় লুকোনো ছিল, রূপকথার কল্পবৃক্ষে ঝাড়া দিলেই যেমন তার থেকে সোনা রূপা ঝরে পড়ত, তেমনি তাঁর গানের গাছে নাড়া দিলেই চাইতে না চাইতে রকমারী গানের ফল টুপ করে খসে পড়ত। সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টিশীল প্রতিভা। নব-নবোন্মেষশালিনী সুর সৃজনের প্রতিভার তিনিই তাঁর তুলনা, তাঁর আর কোনো দোসর নেই।' এ খুবই খাঁটি কথা। একমাত্র ভক্তিগীতির ক্ষেত্রেই তিনি ইসলামী গান সহ পৌণে এক হাজারের কাছাকাছি ভাবসঙ্গীত রচনা করেছেন যার প্রতিটিই ভাব, ভাষা ও সুরে অনবদ্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে কৃষ্ণনগরে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়েছিল ১৯২৬ সালে। হুগলীতে প্রথম পুত্র কৃষ্ণমহম্মদ জন্মের কিছু পরেই লোকান্তরিত হলে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল অর্থাৎ অরিন্দম খালেদকে অতিরিক্ত স্নেহ আদরে মনের মতো করে গড়ে তুলছিলেন নজরুল। সেটা ছিল কবির গজল গান রচনা ও গাওয়া আরম্ভের বছর। অবরুদ্ধ কোনো ঝরণার মুখ খুলে দিলে যে অবস্থা দেখা দেয়, নজরুলেরও তখন প্রায় সেই অবস্থা। একের পর এক গজল গান তিনি লিখে চলেছেন এবং সুর দিয়ে চলেছেন আর সেই সব গানে সুরবিলাসী বাঙালী তখন মাতোয়ারা। কোন গজল গানটি তিনি প্রথম রচনা করেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও সে আলোচনা এখানে

নিষ্প্রয়োজন। তবে বুলবুলের জন্ম-বছরেই নজরুলের যে গানের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল কবি সে গ্রন্থখানির নামই দিয়েছিলেন 'বুলবুল' তাঁর অতিপ্রিয় দ্বিতীয় পুত্রের নামানুসারে।

গজল সঙ্গীতের উৎপত্তি-স্থল পারস্য হলেও নজরুলের বাংলা গজল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত শ্রোতাকেই দীর্ঘকাল ধরে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে এবং এক সময়ে উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরাই গজল গানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনের সেরা গজল গাইয়েদের মধ্যে আঙ্গুরবালা, গিরীন চক্রবর্তী ও আব্বাস উদ্দীনের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। আর যে সব গজল সঙ্গীত বাঙালী কখনো ভুলতে পারবে না তার মধ্যে উল্লেখ করা যায় 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিসনে আজি দোল', 'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী', 'বসিযা বিজনে কেন একা মনে', 'নিশি ভোর হল জাগিয়া', 'কে বিদেশী বন-উদাসী', 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম', 'উচাটন মন ঘরে রয় না', ইত্যাদি গানগুলি। তবে জনপ্রিয়তায় নজরুলের যে গজল গানটি আজও তুলনারহিত সেটি হলো 'আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়'। এ গানটি আজও মুখে মুখে, আসরে আসরে শুনতে পাওয়া যায় এবং বোধহয় কোনো কালেই এ গান পুরোনো হবে না। নজরুল প্রবর্তিত গজল গান কবির অতিপ্রিয় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধন-প্রয়াসের সহায়ক হয়েছে সন্দেহ নেই। ছড়ার গান এবং হাসির গানও কম লেখেন নি নজরুল। তার কিছু কিছুর উল্লেখও করা হয়েছে আগে। তাঁর ছড়ার গান: 'ঘুম পাড়ানী মাসীপিসী ঘুম দিয়ে যেয়ো, বাটা ভরা পান দেবো গাল ভরে খেয়ো, আয় ঘুম আয়।' এমনি ঘুম পাড়ানী গান আরো রয়েছে তাঁর পল্লীগীতি সংকলনে। গোপালকে ঘুম পাড়ানো নিয়ে গান বেঁধেছেন নজরুল—'আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়, মোর গোপাল ঘুমায়—বহু রাত্রি হলো আর জাগাস না মা'য়।' ভাওয়াইয়া সুরে লেখা কবির 'কুচবরণ কন্যারে তোর মেঘবরণ কেশ, আমায় নিয়ে যাওরে নদী সেই সে কন্যার দেশ।'—এ নজরুলের আরেকটি অবিস্মরণীয় গান।

কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, ঝুমুর, কাওয়ালী ইত্যাদি নানা জাতীয়

পল্লীগীতি রচনা করে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছেন নজরুল! কীর্তন বলতে শুধু কৃষ্ণকীর্তন নয়, কালীকীর্তন এবং কৃষ্ণকীর্তন দুই-ই। শ্যাম ও শ্যামাকে নিয়ে তিনি যেমন বহু ভক্তিগীতি রচনা করেছেন তেমনি অনেক ইসলামী ভক্তি সঙ্গীতেরও তিনি রচয়িতা। এখানে তেমনি কয়েকটি ভক্তিগীতি উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে নজরুল কত বড়ো ভক্ত ছিলেন। একটি ইসলামী গানে নজরুল বলছেন ঃ

মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে॥
ঐ নামেরই মধু চাহি।
মন-ভোমরা বেড়ায় গাহি'
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি
ঐ নামের অনুরাগে।

এই ধরনের ইসলামী ভাবসঙ্গীতে প্রকৃত ভক্তের মনোভাব যেরূপ স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, তাতে একদা যে সমস্ত মুসলমান কবি নজরুলকে বিধর্মী বলে গালমন্দ করতেন, পরে তারা তাঁদের মত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। আসলে কাজী নজরুল ছিলেন এক সমন্বয়বাদী খেয়ালী কবি-সৈনিক যিনি প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ঈশ্বরেরই অবিচারের বিরুদ্ধে। সে ঈশ্বর যেমনি হিন্দুর তেমনি মুসলমানের, তেমনি অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের। মানুষের মধ্যেই কোনো প্রভেদ যিনি স্বীকার করতেন না, তাঁর কাছে এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ঈশ্বর অকল্পনীয় তো হবেই। ঠিক তেমনি তাঁর কাছে শ্যাম-শ্যামাও ছিল একই দেবতার দুইরূপ। তেমনি দু'টি ভক্তিগীতির উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একটি শ্যাম সঙ্গীতে কবি তাঁর দুঃখের দিনের পটভূমিকায় গাইছেন ঃ

তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই নিবিড় করে ধরি
আমি ভয় করি কি হরি॥

আমি শূন্য ক'রে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেব বক্ষে তুলি,
আমি করব দুঃখের অবসান আজ
সকল দুঃখ বরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥
তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল,
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর
সকল শূন্য ভরি'।
আমি ভয় করি কি হরি॥

এমনি আত্মনিবেদন ও আবাহনের সুরই অতি হৃদয়গ্রাহীরূপে প্রকাশ পেয়েছে ভক্ত কবি নজরুলের বিভিন্ন শ্যামা সঙ্গীতেও। তারই একটি এখানে তুলে ধরা যাক :

আর লুকাবি কোথায় মা কালি।
আমার বিশ্বভুবন আঁধার ক'রে
তোর রূপে মা সব ডুবালি॥
আমার সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে
বেড়াস্ মা তায় আগুন জ্বালি'
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে যে তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি॥
আমি পূজা করে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
বস্ মা সেথা দুখ্-দুলালী॥

শ্যাম-শ্যামায় কবি যে কোনো প্রভেদ স্বীকার করতেন না, তা তিনি আরেকটি অপূর্ব সমন্বয়ী গানে আমাদের অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে গেছেন। সর্বজন পরিচিত সেই গানটিতে তিনি লিখেছেন :

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম।
মা হবেন মোর মন্ত্রগুরু
ঠাকুর হবেন ঘনশ্যাম।
... .
আমি কৈলাসে তাই মাকে ডাকি
দেখব বলে ব্রজধাম।

ত্রিশের দশকে স্ত্রীর গুরুতর অসুস্থতায় (বাতব্যাধি) অধীর হয়ে উঠেছিলেন কবি। প্রমীলা দেবীকে রোগমুক্ত করে তোলবার জন্যে অকাতর অর্থব্যয়ে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না নজরুলের। পীর-ওঝা-বৈদ্য, ঝাড়ফুক, হোমিওপ্যাথি-এলোপ্যাথি কোনো রকম চিকিৎসাই তিনি বাকী রাখেন নি। তারপরে প্রগতিবাদী নজরুল এমন কাণ্ড করলেন যা ভাবা যায় না। স্ত্রীকে সুস্থ করে তোলবার আশায় তারকেশ্বরে গিয়ে 'হত্যা' দিয়ে পড়ে থাকলেন বাবা তারকনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে, পাঁঠা বলি দিয়ে মা কালীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন এবং মসজিদে মসজিদে মানত করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

কিছুদিন আগে থেকেই কবি-গীতিকার ও গায়ক নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর গীতরচয়িতা ও গানের শিক্ষক রূপে এবং সিনেমার গান লিখে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন বটে কিন্তু স্ত্রীর অসুখে তাঁকে শূন্য-হাত হতে হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই সুসময়ের বন্ধুরা অসময়ে প্রায় সকলেই তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যান। নিরুপায় হয়ে সামান্য মূল্যে কবি সুযোগসন্ধানী প্রকাশকদের কাছে তাঁর বইগুলির কপিরাইট বিক্রি করতে থাকেন। ঠিক সে সময়েই তাঁর মধ্যে এমন একটা গভীর অন্তর্মুখীনতা লক্ষ্য করা যেতে থাকে যা তাঁকে শ্যামা সাধনায় টেনে নিয়ে যায়। তিনি 'জবা' ফুলের মতো মা কালীর চরণে আশ্রয় পেতে চেয়ে গান রচনা করে বসেন :

বলরে জবা বল্
কোন্ সাধনায় পেলিরে তুই

শ্যামা মায়ের চরণ তল্‌।
তোর সাধনা আমায় শেখা
জীবন হোক সফল।

মহাযোগী গৃহী তান্ত্রিক বরদাবাবুকে (লালগোলা স্কুলের শিক্ষক) গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন নজরুল তন্ত্রসাধক হবেন বলে। কিন্তু গুরু তাঁকে নিষেধ করেছিলেন সে পথে যেতে। তবুও সেই নিষেধাজ্ঞা না শুনেই কবি অন্তরের অস্থিরতায় ভক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যান এবং একের পর এক ভক্তিমূলক গান রচনা করে চলেন।

সেটা ১৯৩৬-৩৭ সালের কথা। সেই থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পুরোপুরি সাধক কবি হয়ে যান। গৃহ সংসারে আর তাঁর মন নেই। এ সময়ে তাঁর রচিত একখানি কীর্তন গানে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। সেই কীর্তনখানিতে তিনি বলছেন:

আমি কি সুখে লো গৃহে রব
শ্যাম হ'ল যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব।

এ ভাবেই তিনি যোগের পথে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কোনো পূজা প্রার্থনায়, কোনো চিকিৎসায় স্ত্রীকে নিরাময় করে তুলতে না পেরে কবি আবার যেন মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী—ঈশ্বরের ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে, রোগ ও জরার বিরুদ্ধে এবং সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধে। হিন্দু-মুসলমানের কলহের অবসান ঘটাতে না পারায়ও নজরুল খুব মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। তবু দেশী-বিদেশী নানা সুরের গানে ডুবে থেকে যেন সব বেদনা ভুলে থাকতে চাইতেন।

একদিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। বোধহয় আটত্রিশ-উনচল্লিশ সালের কথা। নজরুল থাকেন তখন হরি ঘোষ স্ট্রীটে। আমি আগে থেকেই ছিলাম পাশের রাস্তা হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীটে। আমার এক সহকর্মী সাংবাদিক বন্ধু শ্রীসৌরীন মজুমদার একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। আমাদের খুব কাছেই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর (রূপবাণীর উল্টো ফুটপাতে) ছিল সেই পত্রিকাখানির অফিস।

আমরা একদিন দোতলায় সেই পত্রিকা কার্যালয়ে নজরুলের গানের আসর বসিয়েছিলাম। ভরতি পানের ডিবা সামনে রেখে এবং কাপের পর কাপ চা নিঃশেষ করে কবি-গায়ক তাঁর একের পর এক পল্লীগীতি, দেশাত্মবোধক এবং ভক্তিমূলক গানে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। সেই অনর্গল গাইয়ে চির-বিপ্লবী খেয়ালী কবি-সৈনিক বছর তিন বাদে ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের কালে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে যাবেন তা কেউ কোনো দিন ভাবতেই পারেনি। সাহিত্যিকবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা নজরুল নিরাময় সমিতি গঠন করে প্রথমে কবিকে রাঁচিতে রেখে মনোরোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কোনো ফল না পাওয়ায় তাঁকে সস্ত্রীক ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়ে প্রায় ছয় মাস ধরে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হলো, কিন্তু সবই ব্যর্থ। এর পর কবি-দম্পতীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ভিয়েনায়। সেখানেও ব্যর্থ হওয়ায় ওরা রোম হয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। বেশ কয়েক বছর থাকলেন পাইকপাড়া অঞ্চলে কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধের ভাড়া বাড়িতে। তখনও আমি তাঁর প্রতিবেশী। মাঝে মাঝে কবি ও প্রমীলা দেবীকে দেখতে যেতাম, বিশেষ করে কবির প্রতিটি জন্মদিনে যেতামই। শুধু স্মৃতিভ্রংশতাই নয়, কেমন একটা ক্ষিপ্ততাও তখন কবির মধ্যে লক্ষ্য করতাম। মনে প্রশ্ন জাগতো, একি রণক্লান্ত মহাবিদ্রোহীর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মেটানোর ব্যর্থতার এবং দেশ তথা বঙ্গ-বিভাগের গভীর বেদনারই ফল? তাই কি তিনি অভিমানে নির্বাক, তাই কি তাঁর এই প্রচণ্ড বিক্ষোভ? এমনি এক জন্মদিনে পূর্বেকার শান্ত-সৌম্য নজরুলকে মনে করে একটি ছোট্ট কবিতায় তাঁকে প্রণাম করে এসেছিলাম। সে কবিতায় লিখেছিলাম:

শান্ত সৌম্য কোন বিবাগী
কোন্ সে বাউল কি তাঁর নাম,
বীণায় যাহার আগুন জ্বলে
সে ধূমকেতু কি পূর্ণকাম?

কাব্যে গানে সুরের দোলায়,
তুফান বয়ে আনলো যে,
তাঁর কথা এ বাঙলাদেশে
কেমন কবে ভুলবে কে ?
আজ ঘুরি যে মুক্ত হাওয়ায়,
তাতেই কি তাঁর একটু দান ?
কবি শুধু কবিই তো নন
দ্রষ্টা মানুষ পুরুষ-প্রাণ।

সেই বিদ্রোহী কবি নজরুলের এবং তাঁর গুরু রবীন্দ্রনাথের (যাঁর নাম কাজী অনুক্ষণ বক্ষে ধারণ ক'র রেখে বলেছিলেন 'তোমারই বিদ্যুত ছটা আমি ধূমকেতু') গানে গানে পূর্ববঙ্গের মানুষদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি হলো এবং সেই উন্মাদনার ফলেই পূর্ববাঙলার মানুষেরা পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টি করলো স্বাধীন বাঙলাদেশ। বাঙলাদেশের স্রষ্টা আরেক বিদ্রোহী বাঙালী মুজিবুর রহমান। তিনি পরম আদরে ও মহাসমারোহে ১৯৭১ সালে বিদ্রোহী কবিকে নিয়ে গেলেন বাঙালীর সেই নতুন স্বাধীন বাঙলাদেশে, সেখানে যাতে কবি আনন্দে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন সে আশায়। কিন্তু তাও হবার নয়। তাঁর স্বপ্নের দেশ যে অখণ্ড বাঙলা ও অখণ্ড ভারত ! তাই মনে হয় জীবনের শেষ যে পাঁচটি বছর তিনি ঢাকায় ছিলেন তখন হয়তো ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতি বিস্ফোরণে কাজী-কবির 'শেষ আরতি' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যেতো। সে কবিতায় নজরুল তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে লিখেছেন :

পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ শিখায়
লহ আমার শেষ আরতি !
ওগো আমার পরম গতি
ওগো আমার পরম পতি ॥
বহু সে কাল বাহির দ্বারে
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে
এবার দেহের দেউল ভেঙ্গে

দেখব নিঠুর, তোমার জ্যোতি ॥
আমি তোমায় চেয়েছিলাম
শুধু এই সে অপরাধে
ধ্যান ভেঙেছ আমার, ফেলে
নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদে।
আজ মায়ার ঘরে আগুন জেলে
পালিয়ে যাব পাখা মেলে,
জীবন যাহার মিথ্যা স্বপন
মরণে তার নাইক ক্ষতি
... ...
আবার যদি তোমার মায়ায়
রূপ নিতে হয় নূতন কায়ায়,
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়
সেথায় যেন না হয় গতি ॥

'মায়ার ঘরে আগুন জেলে' বিদ্রোহী কবি ও ভক্ত কবি নজরুল চিরতরেই পালিয়ে গেলেন ঢাকা থেকে ১৯৪৬ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখে। আবার যদি তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয় তা হলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাঁকে ঈশ্বরের প্রকাশ যেখানে রুদ্ধ সেখানে পাঠাবেন না। তাঁকে পাঠাবেন তাঁর প্রিয় বাঙলা দেশেই যে দেশকে তিনি নিত্য স্মরণ ও প্রণাম করতেন 'নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম চির-মনোরম চির-মধুর' বলে এবং সকলকে ডেকে ডেকে বলতেন, 'আমার শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।'

তবে নজরুল আজ আমাদের মধ্যে না থাকলেও তিনি তো তাঁর 'পার্থসারথী' কবিতায় বলেছেন, 'মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে'—তাই নজরুলের মৃত্যু নেই, তিনি অমর হয়েই রয়েছেন।